Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুহাম্মাদ (সা) আমাদের নবী ও নেতা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মো: রুমি ইবনে ইউসুফ

রোলঃ 228011334

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুহাম্মাদ (সা) আমাদের নবী ও নেতা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মো: রুমি ইবনে ইউসুফ

রোলঃ 228011334

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মুহাম্মাদ (সা) আমাদের নবী ও নেতা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মো: রুমি ইবনে ইউসুফ, আইডিঃ 228011334 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মুহাম্মাদ (সা) আমাদের নবী ও নেতা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Rumy

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

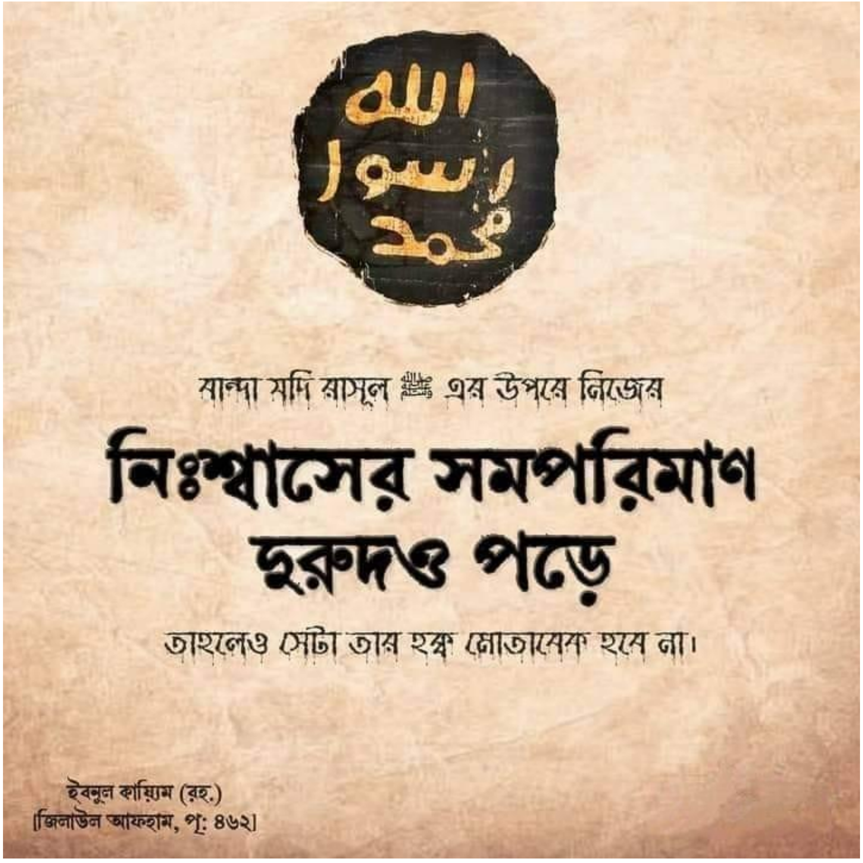
মো: রুমি ইবনে ইউসুফ

আইডিঃ 228011334

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র


বান্দা যদি রাসূল ﷺ এর উপরে নিজের
নিঃশ্বাসের সমপরিমাণ
দুরুদও পড়ে
তাহলেও সেটা তার হক্ব মোতাবেক হবে না।
ইবনুল কায়্যিম (রহ.)
[জিলাউল আফহাম, পৃ: ৪৬২]

ভূমিকা

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সর্বশেষ রাসূল ও নবী। তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন না। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন,

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ

"মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং নবীদের মধ্যে শেষ।" — (সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৪০)

মহানবী (সা) নবুয়ত কোনো নির্দিষ্ট জাতি বা অঞ্চলভিত্তিক নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

"আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে।" — (সূরা সাবা: ২৮)

রাসুলুল্লাহ (সা.) শুধু শেষ নবীই নন, তিনি সকল নবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং নেতা। রাসুল (সা.) বলেন, **"আমি কিয়ামতের দিন আদম (আ.)-এর সব সন্তানের নেতা হবো — এতে কোনো অহংকার নেই।"** — (সহিহ মুসলিম, হাদীস: ২২৭৮)

নবিজি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নেতৃত্ব ছিল এমন এক অনন্য উদাহরণ, যা শুধুমাত্র ধর্মীয় নেতা হিসেবে নয়, বরং রাজনৈতিক, সামাজিক, সামরিক ও নৈতিক সকল ক্ষেত্রেই মানবজাতির জন্য চূড়ান্ত আদর্শ।

আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর জীবন আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। তিনি হলেন "উসওয়াতুন হাসানাহ" — উত্তম অনুসরণীয় চরিত্র। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا

অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে। - (সুরা আহযাবঃ২১)

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, রাসূল (সা)-এর বাণী, কর্ম ও তাঁর সামগ্রিক অবস্থাকে অনুসরণ করার জন্য এই আয়াতটি একটি বড় ভিত্তি (ইবনু কাছীর, ঐ আয়াতের তাফসীর দ্রঃ ৬/৩৯১)। কারণ রাসূল (সা)-এর সামগ্রিক জীবনকে অনুসরণ করলে কুরআনকেই অনুসরণ করা হবে। আয়েশা (রাঃ)-কে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন। তোমরা কি জানোনা যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ**

"আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।" - (সূরা কলম: ৪) -আহমাদ হা/২৪৬৪৫; সহীহুল জামে' হা/৪৮১১)।

কুরআনে এসেছে নবীজীর স্মরণকে উঁচু করার ঘোষণা, **وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ** "**আমি তোমার স্মরণকে উচ্চ করে দিয়েছি।**" - সূরা ইনশিরাহ (৯৪:৪) ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর তাফসীরে বলেন: "আযানে, ইকামতে, খুতবায়, এবং তাশাহহুদে – যেখানে আল্লাহর নাম উচ্চারণ হয়, সেখানে মুহাম্মাদ (সা.)-এর নামও উচ্চারণ করা হয়।"

- তাফসীর ইবনে কাসীর। প্রতিদিন কোটি কোটি বার আযানে উচ্চারিত হচ্ছে নবীজীর নাম أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল।" বিশ্বব্যাপী প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত সালাতের আযানে প্রতিবারই উচ্চারিত হয় তাঁর পবিত্র নাম। এভাবে মুহাম্মাদ (সা.)-এর স্মরণ আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে প্রতিধ্বনিত হয়। আযানের জবাবের পর পরই নবীজীর জন্য দোয়া করা হয়, اللَّهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ... وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

- (সহীহ বুখারী: ৬১৪)। এই দোয়ার মাধ্যমে উম্মতরা প্রতিদিন হাজারো বার তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি ও সুপারিশের স্থান প্রার্থনা করে — এটি এক অনন্য সম্মান। এটি নবীজীর মু'জিযার অংশ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি পূরণ। আযানের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর স্মরণ এই পৃথিবীতে যতদিন সালাত থাকবে, ততদিন চলতে থাকবে। কোনো বাদশাহ, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, এমনকি নবীও এমন সম্মান পাননি। এটি শুধু মুহাম্মাদ (সা.)-এর জন্য নির্ধারিত হয়েছে।

তিনি ছিলেন "কুদওয়াতুন রাফিআহ" — সর্বোচ্চ পর্যায়ের পথপ্রদর্শক। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণের মাঝেই নিহিত রয়েছে শান্তি ও মুক্তির নিশ্চিত পথ। তাঁর পবিত্র জীবনী নিয়ে এত অগণিত গ্রন্থ রচিত হয়েছে যে, তার প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করাও আজ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। একেক সীরাহ গ্রন্থের রয়েছে একেক সুবাস। কোন একক সীরাহ গ্রন্থই নবীজির (সা) জীবনের সম্পূর্ণ দিক ও শিক্ষা তুলে ধরতে পারে নি। আর এই অধমের লেখা থিসিসে তো তা কোনভাবেই সম্ভবই না। বরং এই থিসিসটি হোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্য বৃদ্ধি, আল্লাহর দ্বীনকে আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠিত করতে নববী মানহাজের অনুসরণ এবং হাশরের দিন হাউজে কাউসারে তাঁর হাতে পানি পান করতে পারা ও তাঁর শাফায়াত লাভে ধন্য হওয়ার মাধ্যম।

"*ফিদাকা আবি ওয়া উম্মি ইয়া রাসুলাল্লাহ ﷺ*

আমার বাবা-মা আপনার জন্য কুরবান হোক ইয়া রাসুলুল্লাহ ﷺ"

কুরআন মাজীদে নবীজী (সা) এর পরিচয়

কুরআনুল কারীমে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিচয় এসেছে একজন তাওহীদের আহ্বানকারী, চরিত্রবান, দয়ালু নেতা, সর্বশেষ নবী এবং বিশ্বজগতের জন্য রহমতরূপে। কুরআন মাজীদে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিচয় অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ, গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এবং বহুমাত্রিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন সূরা ও আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গুণ, দায়িত্ব, চারিত্রিক মহত্ত্ব ও তাঁর উম্মতের জন্য গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন।
আল্লাহ কুরআন মাজিদে বলেন,

" وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ"

"আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য রহমতরূপে পাঠিয়েছি।" — সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৭

নবীজি (সা) কে প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا

"তিনিই সেই সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন, যাতে একে সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করেন। আর আল্লাহই যথেষ্ট সাক্ষী। সূরা আল-ফাতহ: ২৮
আল্লাহ আরো বলেন,

" يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا"

"হে নবী! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে।"

— সূরা আহযাব: ৪৫
আল্লাহ আরো বলেন,

" مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَـٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ"

"মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের কেউ নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং নবীদের সিলমোহর (শেষ নবী)।" — সূরা আহযাব: ৪০
কুরআনে এসেছে,

"قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا"

"বলুন: হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের জন্য প্রেরিত আল্লাহর রাসূল।" — সূরা আ'রাফ: ১৫৮

নবীজি (সা) সুমহান চরিত্র সম্পদ সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, **وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ** **'নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।'** [আল-ক্বলাম (৬৮) : ৪]

নবীজির (সা) জবানিতে নবীজির (সা) এর পরিচয়

রসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজের ব্যাপারে বলেছেনঃ

"أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي"

"**আমি নবীদের সিলমোহর; আমার পরে আর কোনো নবী নেই।**" — আবু দাউদ: ৪২৫৭; তিরমিযী: ২২১৯; সহীহ হাদীস

রসূলুল্লাহ (ﷺ) আরো বলেনঃ

"انا نبي الملحمة و نبي الرحمة"

"আমি যোদ্ধা নবী, আমি রহমতের নবী।" - (মুসনাদে আহমদ ১৮৭০৪, সহিহ ইবনে হিব্বান ৬৪২০, ইবনে তাইমিয়ার আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, পৃষ্ঠা/৮, মানঃ সহিহ)
নবীজি নিজেই বলেন:

"أَنَا النَّبِيُّ لا كَذِبَ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَا النَّبِيُّ الرَّحْمَةِ، أَنَا نَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ"

"**আমি নবী, এতে কোনো মিথ্যা নেই। আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান। আমি রহমতের নবী, আমি যুদ্ধের নবী (নবীউল মালহামাহ)**।"

— মুসনাদে আহমাদ: ২৭৮৫৪,মুসনাদ আবু ইয়ালা: ৪০৬০,সুনান কুবরা (বায়হাকি): ৯/৮, হাদীসটি হাসান বা সহীহ লিগাইরিহি।

"انا رسول الرحمة ، وانا رسول الملحمة بعثت بالجهاد ولم أبعث بالزراع"

"আমি রহমতের রাসুল, আমি মালহামা (মহাযুদ্ধের) রাসুল। আমি জিহাদের সহিত প্রেরিত হয়েছি ক্ষেত-কৃষি করতে প্রেরিত হই নি।" - (কানযুল উম্মাল, হাদিস নং- ৩২১৬৭)

"إن الله بعثني ملحمة ومرحمة لم يبعثني تاجرا ولا زراعا"

"নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে রহমতওয়ালা এবং মহামুদ্ধওয়ালা নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন। আমাকে ব্যবসায়ী ও কৃষক বানিয়ে প্রেরণ করেননি।" - (কানযুল উম্মাল, হাদিস নং- ১০৫০০/১০৫০১)
নিজের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে নবীজি (সা) বলেন,

"أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ"...

"আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, যেন আমি মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।'"— সহীহ বুখারী: ২৫, সহীহ মুসলিম: ২২

পুর্ববর্তী আসমানী কিতাবেও রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এই গুণের কথা বলা হয়েছে। ইমাম সারাখসি রাহিমাহুল্লাহ তাওরাতে বর্ণিত কথা আপন কিতাবে এভাবে নকল করেছেন-

"وصفته في التوراة :نبي الملحمة عيناه حمراء و ان من شدة القتال"

"তাওরাতে তাঁর গুণাবলীঃ মহাযুদ্ধওয়ালা নবী, যুদ্ধেও কঠোরতার কারণে তাঁর চোখ রক্তিম বর্ণের হবে।**"** - (শরহে সিয়ারে আল কাবির **১/১৯**)

রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

"وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ"

"তোমরা জেনে রাখ, তরবারির ছায়া-তলেই জান্নাত।" - (বুখারী ২৮১৮)

ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

"بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ"

"আমি (কিয়ামতের পূর্বে) তরবারি-সহ প্রেরিত হয়েছি, যাতে শরীকবিহীনভাবে আল্লাহর ইবাদত হয়। আমার জীবিকা রাখা হয়েছে আমার বর্শার ছায়াতলে। অপমান ও লাঞ্ছনা রাখা হয়েছে আমার আদেশের বিরোধীদের জন্য। আর যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদেরই দলভুক্ত।" - (আহমাদ ৫১১৪-৫১১৫, ৫৬৬৭, শুআবুল ঈমান ৯৮, সঃ জামে' ২৮৩১, হাদিস সম্ভার **১৯০০**, মান: সহিহ)

ইব্নু 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেনঃ

"أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ"

"আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য নির্দেশিত হয়েছি, যতক্ষন না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রসূল, আর সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত আদায় করে। তারা যদি এগুলো করে, তবে আমার পক্ষ হতে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করলো; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর উপর অর্পিত।" - (সহিহ বুখারী ২৫, মুসলিম ৩৩, ৩৪ ৩৫ ৩৬, সুনানে আন নাসায়ী ২৪৪৩, ৩০৯১,

৩০৯৩, ৩০৯৪, ৩০৯৫, ৩৯৯৭, আবু দাউদ ১৫৫৬, ২৬৪০, ২৬৪১, ২৬৪২, তিরিমিজি ২৬০৭, ২৬০৮, ইবনে মাজাহ ৭১, ৩৯২৭, ৩৯২৮, রিয়াদুস সালেহিন ১২১৮, ইত্যাদি, মানঃ সহিহ)

সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে মহানবী (সা.)

সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের বিষয়ে লালায়িত ও আগুয়ান ছিলেন এবং এক্ষেত্রে অনুপম প্রাণবন্ততা, ধৈর্যশীলতা, সংযম ও কষ্টসহিষ্ণুতার স্বাক্ষর রেখেছেন। এসব বিষয়ে তাঁরাই সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ।

হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. এর কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণ নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয় ছিল। নিজের জীবন ও সুস্থতার চেয়েও তিনি অগ্রগণ্য মনে করতেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ও সুস্থতাকে। ফলে নিষ্ঠুর উতবা ইবনে রবীআ যখন তাঁর মুখম-ল আঘাতে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছিল, তাঁর বুকের উপর চড়ে বসে তার উপর নিদারুণ নির্যাতন করেছিল, খবর পেয়ে তার গোত্র বনু তাইম তাকে এমন অবস্থায় উদ্ধার করল যে, তার মারা যাওয়ার ব্যাপারে কারো সংশয় ছিল না। এ অবস্থায়ও দিন শেষে হুঁশ ফিরে পাওয়ার পর সবার আগে যে কথা তার মুখে উচ্চারিত হয়েছিল তা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরাপদ আছেন তো। কওমের লোকেরা তাকে আশ্বস্ত করার পরও তিনি নিশ্চিত হতে পারলেন না, বললেন- আল্লাহর কসম! আমি ঐ পর্যন্ত দানাপানি স্পর্শ করব না, যে পর্যন্ত না তাঁর সান্নিধ্য ও দর্শন পাই! -আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩/৩০

এইরকম প্রাণোৎসর্গকারী আশিকদের আরেক দৃষ্টান্ত ঐ আনসারী সাহাবিয়া, যাকে উহুদ যুদ্ধের পর একে একে তাঁর বাবা, ভাই ও স্বামীর শাহাদাতের সংবাদ দেয়া হয়েছিল, কিন্তু এইসব সংবাদকে উপেক্ষা করে তিনি শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরাপদ থাকার সংবাদই জানতে চাচ্ছিলেন। লোকেরা যখন তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরাপদ থাকার সংবাদ জানাল এবং তিনি স্বচক্ষে তাঁর দর্শন লাভ করলেন তখন বলে উঠলেন-

(আল্লাহর রাসূল! আপনি যখন নিরাপদ আছেন তো সব মুসীবত আমার কাছে তুচ্ছ।) -দালাইলুন নুবুওয়াহ, বায়হাকী ৩/৩০২; সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৯৯

এমনই উৎসর্গপ্রাণ সাহাবীদের একজন আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ বিন উবাই, যিনি তার বাবা (বিখ্যাত মুনাফেক) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে বলতে শুনেছিলেন যে, 'আমরা মদীনায় ফেরার পর সম্মানিত লোকেরা তুচ্ছ লোকদেরকে বের করে দেব।' তিনি তখন বাবার বিরুদ্ধে মদীনার দরজায় তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, তোমরাই এমন কথা বলেছিলে? তো এখনই প্রমাণ হয়ে যাবে, সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত কি তোমরা, না রাসূলুল্লাহ!

তোমরা ঐ পর্যন্ত মদীনার ছায়ায় ঢুকতে পারবে না, যে পর্যন্ত না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে ঢোকার অনুমতি দেন। এরপর সত্যি সত্যি তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতির আগ পর্যন্ত তার বাবাকে মদীনায় ঢুকতে দেননি।
এই জযবা ও নবীপ্রেমের কারণেই তাঁরা তাদের প্রাণকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হতে পেরেছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য স্বজন-স্বদেশ ত্যাগ করা ও আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণ করা তাদের জন্য সহজ হয়ে গিয়েছিল। বরং হিজরত ও শাহাদাতের বিপরীতে প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকাই তাদের জন্য দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। এই অতুলনীয় সমর্পণ ও ভালবাসার কারণেই বদরের যুদ্ধের সময় তারা বলতে পেরেছিলেন- "আমাদের সব বিষয় আপনার হুকুমের অধীন। আল্লাহর কসম! আপনি যদি সুদূর বারক গামদান পর্যন্তও ভ্রমণ করেন আমরা আপনার সাথেই থাকব। আল্লাহর কসম! আপনি যদি আদেশ করেন তাহলে এই সমুদ্রেও আমরা আপনার সাথে ঝাঁপ দেব।"

তথ্য সুত্রঃ পবিত্র সীরাতের সান্নিধ্য : কেন ও কীভাবে? লেখকঃ মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আব্দুল্লাহ, মাসিক আল কাউসার বর্ষ: ১৭, সংখ্যা: ০৭, মুহাররম ১৪৪৩, আগস্ট ২০২১

রোম সম্রাটের হাতে বন্দী সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রা) কে একান্তে ডেকে সম্রাট এ প্রলোভন দিল যে, 'খৃস্টান হয়ে যাও। প্রতিদানে আমার এ বিশাল ভূখণ্ডের অর্ধেক তুমি পাবে।' ইবনে হুযাফার মনে সামান্য চাঞ্চল্যও সৃষ্টি হল না। তিনি স্পষ্ট ভাষায় উত্তর দিলেন- "অর্ধেক রাজত্ব নয়, তোমার পুরো রাজত্ব এবং তার সাথে বিশাল আরব সাম্রাজ্যও যদি আমার হাতের মুঠোয় ভরে দেওয়া হয় তবুও এক পলকের জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—এর আনীত দ্বীন হতে বিচ্যুত হব না।"
অতঃপর একটি বিশাল পাত্রে প্রচণ্ডভাবে পানি ফুটানো হল। ইবনে হুযাফার চোখের সামনে একে একে দুজন মুসলিম কয়েদীকে নির্মমভাবে পানিতে নিক্ষেপ করে শহীদ করা হল। তাদের পরিণতি দেখিয়ে পুনরায় তাকে খৃস্টধর্ম কবুলের ফুরসত দেওয়া হল। আগের মতোই তা প্রত্যাখ্যান করলেন।
এবার তাকে ফুটন্ত পানিতে নিক্ষেপ করার আদেশ দেওয়া হল। ডেগচির সামনে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি মৃদু কাঁদলেন। সম্রাট ভাবল, সে হয়তো দুর্বল হয়েছে। কাছে ডেকে আবারও খৃস্টধর্ম পেশ করা হল। কিন্তু এবারও তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। সম্রাট প্রশ্ন করল, তাহলে তুমি কাঁদলে কেন? ইবনে হুযাফা রা. বললেন, ডেগের কাছাকাছি যাওয়ার

পর আমি ভাবলাম, হায়! কিছুক্ষণ পরই আমার প্রাণপাখি উড়ে যাবে। হায়! আমার শরীরে যতগুলো লোম আছে সে পরিমাণ প্রাণ যদি আমার থাকত তবে একে একে সবগুলোই আমি আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করতাম। এ ভাবনা আসতেই আমার দু চোখ ভিজে উঠেছিল।
- (ইসাবা ৪/৫৯; সিয়ারু আলামিন নুবালা ২/১৪)

মক্কার কাফেরদের হাতে বন্দী হলেন সাহাবী হযরত খুবাইব রা.। বদর যুদ্ধে নিহতদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে তারা তাকে শূলিতে চড়াল। কাফেরদের নিক্ষিপ্ত তীরে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে তার শরীর। এ সময় তাকে জিজ্ঞাসা করা হল তোমার স্থানে আজ মুহাম্মাদকে এনে দিলে কি তুমি খুশি হবে? শুনে হযরত খুবাইব রা.—এর রক্ত কণিকায় শিহরণ জেগে উঠে। শূলী—কাষ্ঠে আবদ্ধ অবস্থায় তিনি বলে উঠলেন, খোদার কসম! কক্ষনো নয়। তাঁর গায়ে একটি কাঁটার আঁচড় লাগুক তাও আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়।

এমন অকৃত্রিম ভালবাসা আর অসীম আত্মত্যাগ দেখে তৎকালন মুশরিকদের সর্দার আবু সুফিয়ান স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন- ‘মুহাম্মাদের সাহাবীরা তাকে যত ভালবাসে, কেউ কাউকে এতে বেশি ভালবাসতে আমি দেখিনি। (আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩/২০৬)

তথ্য সুত্রঃ সীরাত চর্চা সাহাবায়ে কেরাম ও আমরা, লেখকঃ মুহাম্মাদ ত্বহা হুসাইন, মাসিক আল কাউসার বর্ষ: ০৩, সংখ্যা: ০৪, রবিউল আউয়াল ১৪২৮, এপ্রিল ২০০৭

সালাফদের নবিজির (সা) সিরাত চর্চা

সালাফদের কাছে সিরাত ছিল আধ্যাত্মিকতা, শিক্ষা, অনুশীলন ও দাওয়াতের পথনির্দেশিকা। তাঁদের কাছে সিরাত মানে শুধু নবীজির ﷺ জীবন নয়, বরং একজন মুমিনের আদর্শিক পথচলা। তাঁরা সিরাত থেকে নবীজির সদাচরণ, ধৈর্য, করুণা, যুদ্ধনীতি, নেতৃত্বদানের কৌশল, দাওয়াতের পদ্ধতি ইত্যাদি অধ্যয়ন করতেন বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগের জন্য।

ইবনুল জাওযি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

"আমি দেখেছি, ফিকহ অধ্যয়ন ও হাদিস শোনা হৃদয়ের সংশোধনের জন্য যথেষ্ট নয়, যদি না তা সিরাত ও সালাফদের জীবনী অধ্যয়নের সাথে মিশ্রিত হয়। সবচেয়ে উত্তম সিরাত হলো আমাদের নবীর ﷺ সিরাত।"

— আল-আদাবু আশ-শার'ইয়াহ

আল-যুহরি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

"মাগাযি ও সিরাতের জ্ঞান হলো দুনিয়া ও আখিরাতের জ্ঞান।" — আল-ইতিবার

ইবনে কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

"যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু সিরাতের জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। সিরাতের জ্ঞান ছাড়া হৃদয়ের পরিশুদ্ধি অসম্ভব।" — জাদুল মাআদ

আল-ওয়াকিদি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

"নবী ﷺ-এর সিরাত অধ্যয়ন করা হলো ইসলামের মৌলিক অধ্যয়ন।" — মাগাযি আল-ওয়াকিদি

ইবনে সাদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

"নবী ﷺ-এর জীবনের প্রতিটি ঘটনা আমাদের জন্য শিক্ষা।" — তাবাকাত ইবনে সাদ

ইবনে শিহাব আয-জুহরী (রাহিমাহুল্লাহ) ছিলেন সিরাত চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ, যিনি সিরাতের প্রাথমিক রচনাকারীদের একজন এবং খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ-এর অনুরোধে সিরাত লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেন।

ইবনে ইসহাক (রাহিমাহুল্লাহ) সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ সিরাত গ্রন্থ রচয়িতা তার "সীরাহ রসূলুল্লাহ" পরে ইবনে হিশাম সংকলিত ও সম্পাদিত করেন।

ইবনে হিশাম ইবনে ইসহাকের বর্ণনাগুলো যাচাই করে সংক্ষিপ্ত ও সাহিত্যিক রূপে উপস্থাপন করেন।

আল-ওয়াকিদি ও ইবনে সাদ সিরাত ও গাযওয়াহ (নবীজির যুদ্ধসমূহ) বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল রাখেন।

সালাফগণ সিরাত অধ্যয়নকে শুধুমাত্র ইতিহাস জানার উপায় হিসেবে দেখতেন না, বরং এটি ছিল তাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির একটি মাধ্যম। সিরাতের মাধ্যমে তারা নবী ﷺ-এর আদর্শ ও চরিত্রের অনুসরণ করতেন, যা তাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতেন।

পশ্চিমা পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে মহানবী (সা.)

কয়েক শতাব্দী ধরে পশ্চিমা গবেষকেরা অজস্র গ্রন্থ রচনা করেছেন ইসলাম ও মহানবী(সা.)কে কেন্দ্র করে। তবে ইতিহাস জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এই সব গবেষণার বেশির ভাগই পক্ষপাতমূলক, গোঁড়া, নেতিবাচক ও আক্রমণাত্মক। একুশ শতকে এসে তাদের গবেষণা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ শতক থেকেই ধীরে পশ্চিমাদের চিন্তাধারায় একটি ইতিবাচক ধারণা লক্ষ্য করা যায়।

লেখক গেরহার্ড বোওয়ারিং (জন্ম ১৯৩৯) একজন জার্মান একাডেমিক। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইসলাম অধ্যয়ন' বিভাগে অধ্যাপনা করেন। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ৬৬৫ পৃষ্ঠার বিশ্বকোষ সম্পাদনা করেন। 'ইসলামিক পলিটিক্যাল থট: অ্যান ইন্ট্রোডাকশন' প্রবন্ধে তিনি নবীজি (সা.)-কে একজন 'রাজনৈতিক নেতা' আখ্যা দিয়ে লিখেছেন, 'একজন মানুষ এত অল্প সময়ে কীভাবে এত বিশাল অর্জন আয়ত্ত করতে পারেন, তা বিস্ময়কর।...এক সহস্রাব্দেরও বেশি সময় ধরে তিনি একটি বিশ্বে প্রভাব বজায় রাখছেন এবং তাঁর বার্তা আজও বিশ্বব্যাপী আকর্ষণ সৃষ্টি করছে। হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে তার কথামালা পরীক্ষিত হয়েছে এবং তাঁর অনুসৃতি জাতির সদস্যসংখ্যা শতাব্দীকাল ধরে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।'

লেখক তামারা সোন (জন্ম ১৯৪৯) একজন আমেরিকান শিক্ষাবিদ এবং জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলাম ও ধর্মবিষয়ক বিশেষজ্ঞ। *ইসলাম: আ ব্রিফ হিস্ট্রি* তার সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ। বইয়ে 'দ্য এক্সাম্পলারি লাইভ অব মুহাম্মাদ' শিরোনামে তিনি বলেছেন, 'নবী মুহম্মাদ (সা.)-র ভূমিকা কেবল প্রত্যাদেশ ছড়িয়ে দেওয়াতে সীমাবদ্ধ ছিল না', বরং তাঁর জীবন 'মানবতার জন্য একটি আদর্শ। কীভাবে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যাপন করতে হয় এবং প্রতিটি সিদ্ধান্তে আল্লাহর ইচ্ছাতে সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়, তার নমুনা তিনি। কোরআন তার জীবনকে ইসলামের সেরা উদাহরণ সাব্যস্ত করেছে। কোরআনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সুন্নাহ 'মুসলিমদের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে ন্যায়নিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা'।

লেখক জন এল এসপসিতো (জন্ম ১৯৪০) খুবই জনপ্রিয় একজন গবেষক। জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইসলাম ও আন্তর্জাতিকবিষয়ক অধ্যাপক। তিনি একজন ক্যাথলিক খ্রিষ্টান এবং সৌদি প্রিন্স ওয়ালিদ বিন তালালের অর্থায়নে পরিচালিত 'সেন্টার ফর মুসলিম-ক্রিশ্চিয়ান আন্ডারস্ট্যান্ডিং'র প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। ফিলাডেফিয়ার টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়ে

তিনি প্রভাবশালী মুসলিম স্কলার ইসামাইল রাজি আল-ফারুকির (মৃত্যু ১৯৮৬) অধীনে ডক্টরাল গবেষণা সম্পন্ন করেন।

তিনি তার বইয়ে লিখেছেন, 'মুসলিমরা মুহাম্মাদ (সা.)-কে একজন নবী এবং একজন অত্যন্ত মানবিক চরিত্র-সম্পন্ন হিসেবে দেখেন; যিনি একই সঙ্গে রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টিতে সমৃদ্ধ ছিলেন। অথচ খ্রিষ্টানদের দৃষ্টিতে নবী ঈসা (আ.) কেবল আধ্যাত্মিক প্রকৃতি। মুসলিমরা মুহাম্মাদ (সা.)-র উদাহরণ থেকে জীবনের সকল দিকের নির্দেশনা গ্রহণ করেন। কীভাবে বন্ধু ও শত্রুর সঙ্গে আচরণ করতে হয়, কী খেতে ও পান করতে হয়, কীভাবে শোক প্রকাশ ও উদ্‌যাপন করতে হয়—সব। মুহাম্মাদ (সা.) কোরআনে প্রকাশিত নির্দেশনাগুলি জীবনকর্মে রূপান্তর করে দেখিয়েছেন।...তিনি ছিলেন "জীবন্ত কোরআন"। ইসলামে জীবনের কোনো দিক তাই ধর্মের বাইরে নয়। বিশ্বের ইতিহাসের অন্যতম মহান চরিত্র। তিনি আরব জীবনে একটি বিপ্লব নিয়ে এসেছিলেন, যা তাদের জীবনধারাকে বিশুদ্ধ ও পুনর্গঠিত করতে চেয়েছে।'

লেখক উইলিয়াম ই শেপার্ড (জন্ম ১৯৩৩) নিউজিল্যান্ডের খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ। ক্রাইস্টচার্চের ইউনিভার্সিটি অব ক্যান্টারবারির ধর্ম বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। তাঁর বইয়ে 'নবী মুহাম্মাদ (সা.): সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম' শিরোনামে সম্পূর্ণ অধ্যায় রেখেছেন। সূচনা করেছেন এভাবে, যদি কোরআন আল্লাহর কিতাব হয়, তবে মুহাম্মাদ (সা.) হলেন সেই ব্যক্তি, যাঁর মাধ্যমে সেই কিতাব মানবজাতির কাছে এসেছে। তাঁর কথা ও কাজ হলো সেই কিতাবের অগ্রগণ্য ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্য। জীবদ্দশায় তিনি ছিলেন একাধারে নবী, সালিস, রাজনৈতিক নেতা এবং নৈতিক আদর্শ। তারপর বলেছেন, 'মুহাম্মাদ (সা.)-কে একজন সংস্কারক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যিনি তাঁর সময়ের আরবদের সামাজিক ও নৈতিক মানের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটিয়েছেন... তিনি তাঁর অনুসারীদের মধ্যে সমতা ও পারস্পরিক দায়িত্বশীলতার আহ্বান জানিয়েছেন এবং বিশেষ শ্রেণির বিশেষ সুবিধা কিংবা সম্পদের চরম সীমা বিলোপ করতে বলেছেন। তাঁকে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।'

এসব বই মহানবীর (সা.)জীবন সম্পর্কে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পশ্চিমা পণ্ডিতদের অবস্থান ব্যাখ্যা করে এবং পূর্বেকার প্রাচ্যবিদদের থেকে তাদের একটি বিস্ময়কর ব্যবধান স্পষ্ট করে তোলে। মহানবীর (সা.)মহত্ত্ব ও কৃতিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়ার একটি প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

তথ্য সুত্রঃ পশ্চিমা পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে মহানবী (সা.), ইসলাম, প্রথম আলো, লেখা:মনযূরুল হক, প্রকাশ: ২৬ জুলাই ২০২৪

মাইকেল এইচ. হার্ট (Michael H. Hart), একজন আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদ, তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **"The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History"**-এ নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্থান দিয়েছেন। হার্ট তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন:

“My choice of Muhammad to lead the list of the world’s most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels.”

— *Michael H. Hart, The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History*

হার্টের মতে, নবী মুহাম্মদ ﷺ শুধুমাত্র ধর্মীয় নেতা নন, বরং তিনি একাধারে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অপ্রতিরোধ্য প্রভাব বিস্তার করেছেন। তিনি ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ধর্মীয় দিক থেকে সফলতা অর্জন করেছেন, এবং আরব উপদ্বীপের একীকরণ ও মুসলিম সাম্রাজ্যের সূচনা করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অমিত সফলতা দেখিয়েছেন।

মহানবী (সা.)-কে ভালোবাসা ইমানের শর্ত

রাসুল (সা.) বলেছেন, **‘সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ আমি তার কাছে তার পিতামাতা, সন্তানসন্ততি ও সকল মানুষ থেকে প্রিয়তর না হব।’** (সহিহ বুখারি, হাদিস: ১৪ ও ১৫; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৪৪; সুনানে নাসায়ি, হাদিস: ৫,০৩৫)

হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, কাজি আয়ায বলেছেন, ‘মহানবীকে (সা.) ভালোবাসা ইমান বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত।’ (ফাতহুল বারি, ১/৫৯)

কোরআনে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, **‘আপনি বলে দিন, তোমাদের পিতামাতা, সন্তানসন্ততি, ভাই-ভগ্নী, স্ত্রী-পরিজন, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, ধন-সম্পদ যা তোমরা উপার্জন করেছ, সেই ব্যবসা যার মন্দার আশঙ্কা তোমরা কর এবং ঘর-বাড়ি যা তোমরা ভালোবাস, এসব যদি তোমাদের কাছে আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও তার পথে লড়াই করার চেয়ে বেশি প্রিয় হয়, তবে তোমরা আল্লাহ নির্দেশ পাঠানো পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আল্লাহ পাপাচারীদের সুপথ দেখান না**।’ (সুরা তাওবা, আয়াত: ২৪)

রাসুল (সা.) বলেছেন, **‘তিনটি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে থাকবে, সে ইমানের স্বাদ অনুভব করবে। ১. আল্লাহ ও তার রাসুল তার কাছে অন্য সবকিছু থেকে প্রিয় হবে। ২. মানুষকে সে কেবল আল্লাহর জন্য ভালোবাসবে। ৩. (বিশ্বাসী হওয়ার পর) অবিশ্বাসী অবস্থায় ফিরে যাওয়াকে সে এত অপছন্দ করবে, যতটা আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে**।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস: ১৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৪৩)

আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম (রা.) বলেন, ‘আমরা নবীজির (সা.) সঙ্গে ছিলাম। তিনি ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর হাত ধরে ছিলেন। ওমর (রা.) বললেন, ‘আল্লাহর রাসুল, নিজের প্রাণ ছাড়া আর সবকিছুর চেয়ে আপনি আমার কাছে বেশি প্রিয়।’ রাসুল (সা.) বললেন, **‘না, যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ, (তুমি পরিপূর্ণ মুমিন হবে না) যতক্ষণ আমি তোমার কাছে তোমার নিজের চেয়ে বেশি প্রিয় না হব**।’ ওমর (রা.) বললেন, ‘আল্লাহর শপথ করে বলছি, এখন থেকে আপনি আমার কাছে আপন প্রাণের চেয়ে বেশি প্রিয়।’ নবীজি বললেন, ‘হ্যাঁ, ওমর, এবার হয়েছে।’’ (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬,৬৩২)

তথ্য সুত্রঃ মহানবী (সা.)-কে ভালোবাসা ইমানের শর্ত, ইসলাম, প্রথম আলো, লেখা: ধর্ম ডেস্ক, প্রকাশ: প্রকাশ: ২৬ এপ্রিল ২০২৫

কুরআন ও হাদীসের এই সুস্পষ্ট নির্দেশনা সর্বযুগে মুমিনের চেতনাকে জাগ্রত রেখেছে। তারা আল্লাহর নবীকে প্রাণের চেয়েও অধিক ভালবেসেছেন এবং সমর্পিত চিত্তে তাঁর

আনুগত্য করেছেন। অন্যদিকে ঈমানের দৌলত থেকে বঞ্চিত লোকেরাই আল্লাহর নবীকে ত্যাগ করেছে এবং বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে তাঁর বিরোধিতা করেছে। তাই খোদাদ্রোহীদের রাসূল-অবমাননার ঘটনা নতুন নয়। আর তাদের পরিণতিও কারো অজানা নয়। স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগেও রিসালত-অবমাননার ঘটনা ঘটেছে এবং নবী-প্রেমিক সাহাবীগণ তার সমুচিত জবাব দিয়েছেন।

হাদীসের কিতাবে একজন অন্ধ সাহাবীর ঘটনা আছে। তার দাসী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে গোসতাখি করত। সাহাবী তাকে নিষেধ করতেন। একদিন সে যখন আবার গোসতাখি করল তো সাহাবী তাকে তরবারি দিয়ে শেষ করে দিলেন। ঘটনাটি শোনার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'দামুহা হাদরুন।' অর্থাৎ এ হত্যার কোনো শাস্তি নেই।

ইহুদি-নেতা কাব ইবনে আশরাফ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে গোসতাখি করত এবং নিন্দা ও উপহাসমূলক কবিতা পাঠ করত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রা. তাকে খতম করেছেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪০৩৭)

মদীনা মুনাওয়ারায় আবু ইফক নামক এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিন্দা করে কবিতা রচনা করেছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশে সালিম ইবনে উমাইর রা. তাকে হত্যা করেছেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম ৪/২৮২)

ফতহে মক্কার সাধারণ ক্ষমার সময়ও ইবনে খাতালকে ক্ষমা করা হয়নি। সে আত্মরক্ষার জন্য কাবা ঘরের গিলাফ ধরে রেখেছিল। ঐ অবস্থায় তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশে হত্যা করা হয়। তার দুই দাসীকেও মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছিল, যারা ইবনে খাতাল রচিত কবিতা লোকদের আবৃত্তি করে শোনাত। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৪০৩৫; আলকামিল ইবনুল আছীর ২/১৬৯)

নবী-যুগের এইসব ঘটনা প্রমাণ করে যে, তাওহীনে রিসালাত বা রাসূল-অবমাননা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি চরম অপরাধ, যার শাস্তি মৃত্যুদন্ড। উম্মাহর চার ইমাম এ বিষয়ে একমত। আল্লামা শামী রাহ. বলেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কটুক্তিকারী ঈমান থেকে খারিজ ও হত্যার উপযুক্ত। চার ইমাম এ বিষয়ে একমত।'

তথ্য সুত্রঃ নবীর মর্যাদা, মর্যাদার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মাসিক আল কাউসার বর্ষ: ০৭, সংখ্যা: ০২, রবিউল আউয়াল ১৪৩২, ফেব্রুয়ারী ২০১

আখিরাতে সফল হতে নবীজির (সা) আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা

আখিরাতের অনন্ত জীবনের সাফল্য নির্ভর করে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর দেওয়া নির্দেশনা অনুসরণের ওপর। এই নির্দেশনার একমাত্র বাস্তব রূপ হলেন আল্লাহর রাসূল, মুহাম্মাদ ﷺ।

আমল কবুলের পূর্বশর্তই হলো ইখলাস ও রাসুলুল্লাহ (সা) এর ইত্তেবা। তাঁর আনুগত্য ছাড়া আখিরাতে মুক্তি লাভ অসম্ভব। যে তাঁকে অমান্য করবে, সে চিরস্থায়ী পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কুরআনে এসেছে,

“যে রাসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহরই আনুগত্য করে।”
— *সূরা আন-নিসা (৪:৮০)*

“বলুন: যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার (মুহাম্মাদ ﷺ-এর) অনুসরণ করো; আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন ও তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন।”
— *সূরা আলে ইমরান (৩:৩১)*

“যে তাঁর (রাসূলের) বিরুদ্ধাচরণ করে এবং সঠিক পথ প্রকাশ পাওয়ার পর তাঁর পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে তার মতোই পথ অবলম্বন করতে দিই এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করি— কতই না মন্দ সেই পরিণাম!”
— *সূরা আন-নিসা (৪:১১৫)*

হাদীসের এসেছে, নবীজি ﷺ বলেন:

"তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার কামনা-বাসনাকে আমার আনীত বাণীর অনুগত করে নেয়।”
— *মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস: ১৬৭*

নবীজি (সা) আরও বলেন:

"আমার উম্মত সবাই জান্নাতে যাবে, কিন্তু যারা অমান্য করে তারা নয়।” সাহাবারা জিজ্ঞেস **করলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনার অবাধ্যতা কারা করছে?’ তিনি বললেন: 'যারা আমাকে মান্য করে, তারা জান্নাতে যাবে। আর যারা আমার অবাধ্য, তারাই অমান্যকারী।’**
— *সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মুত্তাফাকুন আলাইহি হাদীস*

ইমাম মালিক (রহ.) বলেন:

“এই উম্মতের প্রথম দিককার লোকেরা নবীর সুন্নাহ অনুসরণের মাধ্যমেই সফল হয়েছিল, যারা শেষ দিকে আসবে, তারা যদি সে পথ অনুসরণ না করে, তাহলে তারা সফল হবে না।”

ইমাম আওযাঈ (রহ.) বলেন:

“তোমার ওপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহর অনুসরণ করা ওয়াজিব, কেননা তিনিই হিদায়াতের পথ।”

অন্য নবীদের প্রসঙ্গে নবীজি (সা)

মহানবী মুহাম্মদ (সা) গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন যে, নবীদের মধ্যে একটি ঈমানী বন্ধন ও একক বার্তার সম্পর্ক রয়েছে। তিনি জানতেন, তাঁর লক্ষ্যও পূর্ববর্তী নবীদেরই ধারাবাহিকতা। যখনই কোনো প্রসঙ্গে কোনো নবীর কথা স্মরণ করা হতো বা তাঁদের নাম উচ্চারিত হতো, তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধাভরে তাঁদের সম্পর্কে কথা বলতেন। তিনি তাঁদের 'নবুওয়াতের ভাই' বলে সম্বোধন করতেন, যা থেকে বোঝা যায়, নবুওয়াতের বন্ধন তাঁর কাছে ছিল এক ভালোবাসার সূত্র। তিনি বিনয় ও কৃতজ্ঞতাভরে তাঁদের গুণাবলির কথা বলতেন এবং তাঁদের সম্মান করতেন। ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণিত একটি হাদিসে আছে যে রাসুল (সা.) তাঁর পূর্বসূরি ও নবুওয়াতের পিতা ইব্রাহিম (আ.)-এর মর্যাদা তুলে ধরে বলেছেন: **'কিয়ামতের দিন সবার আগে যে ব্যক্তি পোশাক পরিধান করবেন, তিনি হবেন ইব্রাহিম (আ.)**।' (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৩,৩৭৭)

রাসুল (সা.) তাঁর নবী ভাই সুলায়মান (আ.)-এর রাজত্বের প্রশংসাও গর্বভরে বলতেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে, রাসুল (সা.) বলেন, **'সুলায়মান (আ.) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন এমন এক রাজত্বের জন্য, যা তাঁর পরে কেউ পাবে না। আল্লাহ তা তাঁকে দান করেছিলেন**।' (সুনানে নাসাঈ, হাদিস: ১০,৪৭৪)

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে তিনি ঈসা (আ.)-কে 'নিকটজন' বলার মাধ্যমে তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, **'দুনিয়া ও আখিরাতে সকল মানুষের মধ্যে আমিই ঈসা ইবনে মরিয়মের সবচেয়ে নিকটজন। নবীগণ একে অপরের ভাই, তাঁদের মায়েরা ভিন্ন, কিন্তু তাঁদের দীন এক**।' (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৩,৪৪৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২,৩৬৫)

তাঁর মা মরিয়ম (আ.)-এর বিশেষ মর্যাদার কথাও তুলে ধরেছেন, যা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে ব্যতিক্রমী সম্মান। আল্লাহর রাসুল (সা.) তা অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে স্বীকার করে বলেছেন, **'আদম সন্তানের মধ্যে এমন কেউ নেই, যাকে জন্মের সময় শয়তান স্পর্শ করে নি, তাই সে চিৎকার করে ওঠে। তবে মরিয়ম ও তাঁর সন্তান (ঈসা)-কে শয়তান স্পর্শ করতে পারেনি**।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২,৩৬৬)

একবার রাসুলুল্লাহ (সা.) তায়েফে ইসলাম প্রচারে যান। সেখানকার মানুষ তাঁর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে এবং এমনকি শিশুরাও তাঁকে পাথর ছুঁড়ে আহত করে। অবশেষে তিনি ও তাঁর খাদেম একটি আঙুর-বাগানে আশ্রয় নেন। বাগানের একজন খ্রিষ্টান কর্মচারী তাদের কিছু আঙুর খেতে দেন। রাসুল (সা.) আঙুর খাওয়ার আগে কিছু অচেনা বাক্য উচ্চারণ করেন। তখন কর্মচারী বিস্ময়ভরে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কোথা থেকে?' নবীজি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কোথাকার লোক?' সে উত্তর দেয়, 'আমি নিনেভেহ শহরের খ্রিষ্টান (ইরাকের উত্তরে)।'

রাসুল (সা.) তখন আনন্দভরে বলেন, 'তুমি কি ইউনুস ইবনে মাত্তার শহর থেকে?'

লোকটি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি ইউনুসকে কীভাবে চিনেন?'
রাসুল (সা.) বলেন, **'তিনি আমার ভাই। তিনি ছিলেন নবী, আমিও নবী।'** - (আর-রাহিকুল মাখতুম, সফিউর রহমান মুবারকপুরি)
আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার এক মুসলিম ও এক ইহুদি তর্কে জড়িয়ে পড়ে। কথার মধ্যে মুসলমান বললেন, 'সেই সত্তার কসম, যিনি মুহাম্মদকে সকল মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন!' ইহুদি বললেন, 'সেই সত্তার কসম, যিনি মুসাকে সকল মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন!'
এ কথা শুনে মুসলমান ব্যক্তি রাগে ইহুদিকে চড় মারেন। তিনি ভাবলেন, নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে অপমান করা হয়েছে। এই ঘটনা রাসুল (সা.)-এর কাছে পৌঁছালে তিনি বললেন, **'মুসার ওপর আমাকে শ্রেষ্ঠ বলো না। কিয়ামতের দিন যখন সবাই অজ্ঞান হয়ে পড়বে, তখন আমি সবার আগে জ্ঞান ফিরে পাব। কিন্তু তখন দেখব, মুসা (আ.) আরশের পাশ ধরে আছেন। আমি জানি না, তিনি কি আমার আগেই জ্ঞান ফিরে পাবেন, নাকি আল্লাহ তাঁকে দুনিয়ায় একবার অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার কারণে বিশেষ রেহাই দেবেন।'** (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২,৩৭৩)
এই হাদিসের আরেক বর্ণনায় উল্লেখ আছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) এই ঘটনায় রেগে গিয়েছিলেন এবং তাঁর চেহারায় রাগের প্রকাশ দেখা গিয়েছিল। তিনি নবীদের মধ্যে এ ধরনের তুলনায় লিপ্ত হওয়াকে স্পষ্টভাবে নিষেধ করেন।
অন্য এক হাদিসে আছে, রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'মানুষদের মধ্যে কে সবচেয়ে সম্মানিত?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত সে, যে সবচেয়ে খোদাভীরু।' তারা বলল, 'আমরা এ বিষয়ে জানতে চাই না।' তিনি বললেন, **'তবে, আল্লাহর নবী ইউসুফ, যিনি ছিলেন আল্লাহর এমন নবীর পুত্র, যিনিও আল্লাহর নবীর পুত্র, তিনিও আল্লাহর খলিলের পুত্র।'** (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৩,৩৮৩)
যদিও মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন এবং নবুওয়াতের শৃঙ্খলে পূর্ণতা এনেছেন, তবুও তিনি সর্বদা নিজেকে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তুলে ধরতেন। তিনি একবার বলেছিলেন: **'লোকসকল, আল্লাহকে ভয় করো এবং শয়তানের ধোঁকায় পড়ো না। আমি মুহাম্মদ, আবদুল্লাহর পুত্র। আমি আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। আমি চাই না তোমরা আমাকে আল্লাহর নির্ধারিত অবস্থানের চেয়ে বেশি উচ্চে তুলে ধরো।'** (মুসনাদ আহমাদ, হাদিস: ১২,৫৫৫)
বিভিন্ন হাদিসে রাসুল (সা.) দেখিয়েছেন যে, নবীদের পারস্পরিক সম্পর্ক শুধু দুনিয়ার নয়—আখিরাতেও তারা একে অপরের ঘনিষ্ঠ। তাঁর কথায় কখনো ঈর্ষার লেশমাত্র প্রকাশ পায়নি, বরং ছিল অন্যদের প্রতি প্রশংসা ও স্বীকৃতি। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, 'পূর্ববর্তী নবী-রাসুলদের সম্মান করা, তাঁদের কৃতিত্ব তুলে ধরা এবং তাঁদের প্রতি বিনয় ও ভ্রাতৃত্বের মনোভাব পোষণ

করা মুসলিম চরিত্রের অংশ। তিনি নবুওয়াতের শৃঙ্খলে এক ঐক্যের বার্তা তুলে ধরেছেন, যেখানে সব নবী ছিলেন এক উদ্দেশ্যে প্রেরিত—আল্লাহর একত্ববাদ ও মানুষের কল্যাণের জন্য।

তথ্য সুত্রঃ অন্য নবীদের কথা মহানবী (সা.) কীভাবে বলতেন, ইসলাম, প্রথম আলো, লেখা: মনযূরুল হক, প্রকাশ: প্রকাশ: ২২ এপ্রিল ২০২৫

একদা হযরত উমর (রাযি.) এক ইহুদি পাণ্ডিতের নিকট হতে তাওরাতের কিছু অংশ নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে পড়তে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চেহারায় বিরক্তির ভাব প্রকাশ পায়। তিনি বলেন:

" قسمتُ أن لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي"

অর্থ: "আমি সেই সত্তার কসম করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ, যদি মূসা (আলাইহিস সালাম) জীবিতও থাকতেন, তাহলেও তাঁর জন্য আমার অনুসরণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকত না।" — মুসনাদ আহমদ: ১৫১৯৫; দারেমী: ৪৩৫; সহীহ লিসানে হাদীসের মানে হাসান লিগইরিহি

এই হাদীস থেকে স্পষ্ট যে, পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ ছিলেন তাদের সময়ের জন্য নির্ধারিত। কিন্তু মুহাম্মদ (সা.) সর্বকালের এবং সর্বমানবতার জন্য প্রেরিত সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী। তাই এমনকি একজন পূর্ববর্তী মহান রাসূল — যেমন হযরত মূসা (আ.), যদি তার সময় অতিক্রম করে নবীজীর যুগে আসতেন, তাকেও তাঁরই অনুসরণ করতে হতো।

নবীজী (সা.) — মিল্লাতে ইব্রাহিম (আ.)-এর পুনর্জাগরক

মুহাম্মদ ﷺ কোনো নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেননি; বরং তিনি মানবতার জন্য প্রেরিত শেষ রাসুল হিসেবে হযরত ইবরাহিম (عليه السلام)-এর আদর্শ, ধর্ম ও তাওহীদের পথকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। "মিল্লাত" অর্থ ধর্ম, জীবনব্যবস্থা বা আদর্শ। আর "মিল্লাতে ইবরাহিম" মানে হলো হযরত ইব্রাহিম (عليه السلام)-এর তাওহীদের (একত্ববাদ) ধর্ম, যা ছিল শিরক থেকে মুক্ত এবং একমাত্র আল্লাহর ইবাদতে নিবেদিত। কুরআনের ঘোষণা: “**তোমরা বলো: আমরা আল্লাহর অনুসারী, এবং সেই জীবনপদ্ধতির অনুসরণ করি, যা ইব্রাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর সন্তানগণ অনুসরণ করেছিল।**" - (সূরা আল-বাকারা: ১৩৫)

"**তোমাদের পিতা ইব্রাহিম — তিনিই তোমাদের মুসলিম নামকরণ করেছেন।**" -(সূরা আল-হজ: ৭৮)

"**رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ**"

“**হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠান, যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন।**” — সূরা আল-বাকারা (২:১২৯)

ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর দুআ আল্লাহ কবুল করেন এবং ইসমাইল আলাইহিস সালামের এর সন্তানদের মধ্য থেকে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে প্রেরণ করেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজে বলেছেন:

"**أنا دعوة أبي إبراهيم**"

“**আমি আমার পিতা ইব্রাহিম (আ)-এর দোআর ফল।**”

— (মুসনাদ আহমদ, হাদীস: ৩৭৫৬)

কুরআনের বহু আয়াত ও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাওয়াত, জীবনাচার ও কুরআনের শিক্ষাই ছিল ইব্রাহিমী আদর্শের পূর্ণ প্রতিফলন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

"ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين"

"এরপর আমি তোমার (হে মুহাম্মদ ﷺ) প্রতি ওহি করলাম: তুমি একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহিমের ধর্ম অনুসরণ করো। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।"
— সূরা নাহল (১৬:১২৩)

আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

"قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين"

"আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার রব আমাকে সরল পথের দিকে পরিচালিত করেছেন — ইব্রাহিমের ধর্মের দিকে, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না"
— সূরা আনআম (৬:১৬১)

মক্কার সমাজে যখন পৌত্তলিকতা ও শিরক চরমে, তখন নবীজী (সা.) ইব্রাহিম (আ.)-এর মতো এক আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানান। কাবা শরীফ ছিল ইব্রাহিম (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত ইবাদতের ঘর, অথচ তার ভেতরেই মূর্তি পূজা হচ্ছিল। নবীজী এই ভ্রান্ত ধর্মীয় প্রথাকে অস্বীকার করে মানুষকে ডাকলেন তাদের আদি পিতার ধর্মে ফিরে আসতে।

ইব্রাহিম (আ.)-এর জীবনে মূর্তিবিরোধী অবস্থান ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট ও সাহসিকতাপূর্ণ। **"তারা বলল: কে আমাদের দেবতাগুলোকে এমন অবস্থা করল? ইব্রাহিম ছাড়া আমরা কাউকে দেখি না।"** - (সূরা আল-আম্বিয়া: ৫৯)

তিনি নিজ হাতে মূর্তিগুলো ভেঙে দিয়েছিলেন, শুধুমাত্র বড়টিকে রেখে দিয়েছিলেন যেন তারা বুঝে নেয় যে এগুলো কিছুই করতে পারে না।

মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) কাবা শরীফে প্রবেশ করেন। সেখানে প্রায় ৩৬০টি মূর্তি ছিল। তিনি নিজের হাতে সেই মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলেন এবং একাধিক সাহাবাকে এই কাজে অংশ নিতে নির্দেশ দেন।

"রাসূলুল্লাহ (সা.) কাঠের একটি লাঠি নিয়ে কাবার গায়ে স্থাপিত মূর্তিগুলো একে একে ভেঙে ফেলছিলেন এবং বলছিলেন —

'جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا'

অর্থ: **"সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই ছিল।"**

(সূরা আল-ইসরা: ৮১; সহীহ বুখারী, ফাতহুল বারী: ৮/১৮)

মূর্তি ধ্বংস শুধু রাজনীতি নয়, ছিল ঈমানের দাবি। মক্কা বিজয়ের এই পদক্ষেপ কেবল একটি রাজনৈতিক বিজয় ছিল না; বরং এটি ছিল ঈমান, তাওহীদ ও ইব্রাহিমী মিল্লাহর বিজয়।

নবীজী (সা.)-এর শিক্ষা অনুযায়ী হজের রীতিনীতি পুরোটাই ইব্রাহিম (আ.)-এর স্মৃতিবিজড়িত। কাবা তাওয়াফ, সাফা-মারওয়া সাঈ, জমরায় কঙ্কর নিক্ষেপ — সবকিছু ইব্রাহিম ও তার পরিবারকে কেন্দ্র করে।

নবী ﷺ বলেছেন:

"أنا أولى الناس بإبراهيم"

"ইব্রাহিমের সাথে সবচেয়ে বেশি সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি আমিই।"

— **সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৩৮২**

নবী মুহাম্মদ ﷺ ইসলামের মাধ্যমে ইব্রাহিম (আ)-এর আদর্শিক ধর্মের পূর্ণতা ও পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছেন। তাই তিনি শুধু একজন নবী নন, বরং মিল্লাতে ইবরাহিম-এর পুনরজাগরক ও পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠাতা।

হিলফুল ফুজুল গঠনে নবীজির (সা.) নেতৃত্ব

হিলফুল ফুজুল (حلف الفضول) — অর্থাৎ “সৎ ও ন্যায়ের পক্ষে সংঘবদ্ধ শপথ” — গঠিত হয়েছিল মক্কার সমাজে দুর্বল, বিদেশি ও নিপীড়িতদের অধিকার রক্ষার জন্য। এটি গঠিত হয় নবিজি (সা)-এর তরুণ বয়সে, তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় ২০–২৫ বছর।
- **সূত্র:** ইবনে হিশাম, *আস-সীরাহ আন-নবাবিয়্যাহ,* খণ্ড ১

হিলফুল ফুজুলের কারণ: এক ইয়েমেনি ব্যবসায়ী মক্কার প্রভাবশালী গোত্রীয় নেতা আস ইবনে ওয়াইল-এর কাছে মাল বিক্রি করেন, কিন্তু দাম ফেরত পান না। তখন সেই ব্যবসায়ী কাবা শরীফের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের জন্য ডাক দেন। এমন সময়, সমাজের কিছু ন্যায়পরায়ণ নেতা — যেমন:

- আবদুল্লাহ ইবনে জুদআন
- জুবায়ের ইবনে আবু উমাইয়া
- নবীজি মুহাম্মাদ ﷺ (তখনও নবুয়তপ্রাপ্ত হননি)

— একত্রিত হয়ে *আস ইবনে ওয়াইলের* মতো জালিমদের বিরুদ্ধে দুর্বলদের পক্ষে দাঁড়ান।

নবিজি (সা.)-এর নেতৃত্বের দিক:

- **সামাজিক দায়িত্ববোধ:**

  নবিজি (সা.) তখনো নবুয়তপ্রাপ্ত হননি, তবুও তিনি সমাজে অন্যায় প্রতিরোধে অগ্রগামী হন।

- **ন্যায়প্রেম ও সাহস:**

  কুরাইশের মতো গর্বিত সমাজে অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে কথা বলা সাহসের বিষয় ছিল। রাসুল (সা.) এ দায়িত্বে সাহসিকতা ও নীতিবোধের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন।

- **পরবর্তী সময়ে স্বীকৃতি:**

  নবুয়তপ্রাপ্ত হওয়ার পরও নবিজি (সা.) বলেন:

"আমি আবদুল্লাহ ইবনে জুদআনের ঘরে যে চুক্তিতে অংশ নিয়েছিলাম, তা যদি আজও কেউ আহ্বান করে, আমি তাতে অংশগ্রহণ করতে রাজি। ইসলাম থাকলেও আমি এতে সাড়া দিতাম।" — (মুসনাদে আহমাদ: ১৬৫৫)

এই বক্তব্যে স্পষ্ট, হিলফুল ফুজুলে অংশগ্রহণকে তিনি সম্মানের বিষয় মনে করতেন, কারণ এটি ন্যায়ের পক্ষে ছিল।

দৃষ্টান্তমূলক নেতৃত্বের প্রভাব:

- নবিজি (সা.) সমাজে **বিচার ও মানবাধিকারের মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করেন**।
- হিলফুল ফুজুলের মাধ্যমে মক্কার তরুণদের একতাবদ্ধ করার উদ্যোগ নেন।
- তাঁর এই নেতৃত্ব **পরবর্তীতে মদিনার ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের মূলে ভূমিকা রাখে।**

হিলফুল ফুজুল গঠন ছিল নবিজি (সা.)-এর জীবনের প্রথমদিকের এক উজ্জ্বল অধ্যায়, যেখানে তিনি অত্যাচারিতের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায়। তাঁর এই ভূমিকা প্রমাণ করে — একজন নেতা শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, সামাজিক সুবিচার ও মানবাধিকারের ময়দানেও নিজেকে প্রমাণ করেন।

কাবা শরিফের পুনর্নির্মাণের সময় নবিজি (সা.)-এর কৌশলগত সমাধান

নবিজি মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক ঘটনা হলো কাবা শরিফের পুনর্নির্মাণের সময় "হাজারে আসওয়াদ" বা পবিত্র কালো পাথর স্থাপনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট মারাত্মক গোত্রীয় দ্বন্দ্ব, যেখানে নবিজি (সা.) তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, নেতৃত্বগুণ ও সুনামের কারণে একটি ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের হাত থেকে গোটা মক্কাকে রক্ষা করেন।

কাবা শরিফ তখন পুনর্নির্মাণাধীন। কুরাইশের গোত্রগুলো একত্রে কাবার বিভিন্ন অংশ নির্মাণে অংশ নেয়। যখন হাজারে আসওয়াদ (পবিত্র কালো পাথর) পুনঃস্থাপনের সময় আসে, তখন প্রতিটি গোত্র এই সম্মানজনক কাজটি করতে চায়। এ নিয়ে চরম বিরোধ সৃষ্টি হয় — এমনকি তারা রক্তপাত পর্যন্ত প্রস্তুত হয়ে যায়। - সীরাতে ইবনে হিশাম, খণ্ড ১

গোত্রগুলো চার দিন ধরে আলোচনায় ব্যর্থ হয়। পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস বাড়ে। অবস্থা এমন পর্যায়ে চলে যায় যে তারা তলোয়ারে হাত রাখে এবং বলার প্রস্তুতি নেয়: "আমরা যুদ্ধ করব, কিন্তু অন্য গোত্রকে পাথর স্থাপনের সুযোগ দেব না।" ঠিক এমন সময়, তাদের কেউ একজন প্রস্তাব দেয়: "যে ব্যক্তি কাবার প্রবেশপথ দিয়ে সবার আগে প্রবেশ করবে, আমরা তার মত অনুযায়ী কাজ করব।"

আল্লাহর ইচ্ছায় সেই ব্যক্তি হন নবিজি মুহাম্মাদ ﷺ। তিনি তখন নবুয়তপ্রাপ্ত হননি, কিন্তু তাঁর চরিত্র, সততা এবং প্রজ্ঞা সবাই জানত। সবাই খুশি হয়ে বলে ওঠে: "এ তো এসেছে আল-আমীন (বিশ্বস্ত ব্যক্তি)!" নবিজি (সা.) বলেন: **"একটি বড় চাদর আনো।"** তিনি হাজারে আসওয়াদ পাথরটিকে সেই চাদরের উপর রাখেন। এরপর প্রত্যেক গোত্রের একজন প্রতিনিধি চাদরের এক একটি কোণা ধরেন এবং সবাই মিলে পাথরটিকে উপরে তোলে।

অবশেষে নবিজি (সা.) নিজ হাতে পাথরটিকে তার নির্ধারিত স্থানে স্থাপন করেন।

- ইবনে কাসীর, *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড ২
- *সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকি*, খণ্ড ৬

নেতৃত্ব গঠনে নবীজির মূলনীতি

নেতা নির্বাচনঃ নেতা নির্বাচনে মহানবী (সা.) কেবল যোগ্য ও বিশেষজ্ঞকে মনোনীত করতেন। এ ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতদুষ্ট অবস্থানকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ক্ষমতা বা পদের জন্য লালায়িত ব্যক্তিকে নেতা নির্বাচন করতেন না। তিনি বলেন, 'আমি এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে এমন কোনও ব্যক্তিকে নিয়োগ করব না, যে তা পাওয়ার জন্য প্রার্থী হবে; অথবা এমন কাউকেও নয়, যে তা পাওয়ার জন্য লালায়িত হবে।' (মুসলিম, হাদিস: ১,৮২৪)

কারণ হিসেবে তিনি বলেন, 'তুমি যদি চেয়ে নিয়ে তা লাভ করো, তাহলে তোমাকে ওই দায়িত্বের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। আর না চাইতেই যদি তা পাও তাহলে তুমি সে জন্য সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। ' (বুখারি, হাদিস: ৭,১৪৭; মুসলিম, হাদিস: ১,৬৫২)

জবাবদিহিতাঃ নবীজির(সা.) নেতৃত্ব পরিচালনার মূলনীতি ছিল কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও অর্থ-সম্পদ আল্লাহ ও মুসলিমদের আমানত। আল্লাহভীরু ও ন্যায়পরায়ণ লোকদের হাতে তা ন্যস্ত থাকবে। কেউ ইচ্ছামত তা নষ্ট করার অধিকার রাখবে না। এ আমানত যাদের হাতে সোপর্দ করা হবে তারা এর দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জবাবদিহি করতে বাধ্য। আল্লাহ বলেছেন, **'আমানত বহনের যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে আমানত সোপর্দ করার জন্য আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।'** - (সুরা নিসা, আয়াত: ৫৮)

পরামর্শ সভা গঠনঃ কোরআনে নবীজি (সা.)–কে পরামর্শের ভিত্তিতে কার্যনির্বাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি তাই মজলিসে শূরা বা পরামর্শ সভা গঠন করেন। আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে বিজ্ঞ সাহাবিরা ছিলেন সভার সদস্য। সদস্যদের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করতেন, তাদের পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। যদিও কোরআন তাকে ক্ষমতা দিয়েছে সে-সব পরামর্শ গ্রহণ না করার বা বর্জন করার। নবীজির (সা.)পরামর্শ গ্রহণের নীতি থেকে বোঝা যায়, নেতা পরামর্শ চাইবেন সংশ্লিষ্ট লোকেরাও পরামর্শ দেবে; কিন্তু তার নিকট যে পরামর্শ বেশি সঠিক ও কল্যাণকর মনে হবে তা তিনি গ্রহণ করবেন।

নবীজি (সা.)বলেছেন, **নেতা হবেন জনগণের সেবক** - (মিশকাত আল মাসাবিহ, হাদিস: ৩,৯২৫)। তিনি তাঁর অনুসারীদের এভাবেই তৈরি করেছিলেন। ফলে প্রসাশনের বিভিন্ন স্তরে নিয়োজিত ব্যক্তিরা নিজেদের জনগণের সেবকের ভূমিকায় উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তথ্য সুত্রঃ নেতৃত্ব গঠনে মহানবী (সা.)–র ৫ মূলনীতি, ইসলাম, প্রথম আলো, লেখা:মনযূরুল হক, প্রকাশ: ২৮ আগস্ট ২০২৩

সমালোচনার মোকাবেলায় নবীজি(সা)

অন্যায় বা অশোভন সমালোচনা মানুষের হৃদয়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে, এমনকি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কেও ফাটল ধরাতে পারে। তবে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) এই ক্ষেত্রে এক অপ্রতিম দৃষ্টান্ত। তিনি শুধু সমালোচনাকে ধৈর্য ও বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করতেন না; বরং তা থেকে ইতিবাচক ফলাফল অর্জনের পথও দেখিয়েছেন। তাঁর জীবন থেকে আমরা শিখতে পারি কীভাবে সমালোচনার মুখে শান্ত থাকতে হয়, কীভাবে দয়া ও ন্যায়বিচার দিয়ে পরিস্থিতি সামলাতে হয় এবং কীভাবে মানুষের হৃদয় জয় করতে হয়।

মহানবী (সা.) তাঁর নবুয়তের সময়ে বিভিন্ন ধরনের সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিলেন। এই সমালোচনা এসেছিল অবিশ্বাসীদের (মুশরিক, মুনাফিকসহ) থেকে এবং কিছুসংখ্যক মুসলিমের পক্ষ থেকেও। অবিশ্বাসীদের সমালোচনা প্রায়ই ছিল ভিত্তিহীন, ব্যক্তিগত আক্রমণ বা অপবাদ, যা তাঁর হৃদয়ে ব্যথার সৃষ্টি করত। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাঁর এই কষ্টের কথা স্বীকার করে বলেন, **'আমরা অবশ্যই জানি যে তারা যা বলে, তা তোমার হৃদয়কে কষ্ট দেয়।'** (সুরা আল-হিজর, ১৫: ৯৭)

অন্যদিকে মুসলিমদের সমালোচনা ছিল ভুল-বোঝাবুঝি বা অপর্যাপ্ত তথ্যের কারণে। তবে উভয় ক্ষেত্রে নবীজি (সা.)-এর প্রতিক্রিয়া ছিল ধৈর্য, ক্ষমা ও দূরদর্শিতার। তিনি কখনো ব্যক্তিগতভাবে সমালোচনাকে গ্রহণ করতেন না এবং শুধু আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হলে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রতিক্রিয়া দেখাতেন। হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, **'নবী (সা.) কখনো নিজের জন্য প্রতিশোধ নেননি, যতক্ষণ না আল্লাহর সম্মান লঙ্ঘিত হয়েছে। তখন তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রতিশোধ নিতেন।'** (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬১২৬)

ঘটনা-১: ইহুদি রাব্বির সমালোচনা ও দয়ার প্রতিক্রিয়াঃ

একবার ইহুদি রাব্বি জায়েদ ইবনে সুনআহ নবীজি (সা.)-এর কাছে তাঁর ঋণের টাকা দাবি করতে আসেন। তিনি অভদ্রভাবে নবীজি (সা.)-এর চাদর টেনে নামান এবং বলেন,'তুমি, আবদুল মুত্তালিবের সন্তান, দেরি করছ।'

এই অশোভন আচরণে উমর (রা.) ক্ষুব্ধ হয়ে রাব্বিকে ধমক দেন এবং তলোয়ার দিয়ে হত্যার হুমকি দেন। কিন্তু নবীজি শান্তভাবে হেসে উমর (রা.)-কে বলেন, 'এ মানুষটি তোমার কাছ থেকে ভালো আচরণের অধিকারী। তোমার উচিত ছিল আমাকে সময়মতো ঋণ পরিশোধের পরামর্শ দেওয়া এবং তাকে ভদ্রভাবে তার দাবি জানানোর অনুরোধ করা।'

তিনি জায়েদকে জানান যে পরিশোধের সময়সীমা এখনো তিন দিন বাকি। এরপর উমর (রা.)–কে ঋণ পরিশোধ করতে ও উমরের আচরণের ক্ষতিপূরণ হিসেবে অতিরিক্ত ২০ মাপ দিতে বলেন। (সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস: ৩৮৮৪)

এ ঘটনা থেকে আমরা শিখি যে নবীজি (সা.) অভদ্র সমালোচনার মুখেও শান্ত থাকতেন, প্রতিশোধের পরিবর্তে দয়া ও ন্যায়বিচার প্রদর্শন করতেন এবং পরিস্থিতি থেকে ইতিবাচক ফলাফল অর্জন করতেন। তাঁর এই আচরণ জায়েদের হৃদয়ে ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়েছিল।

ঘটনা-২: আনসারদের অসন্তোষ ও হৃদয় জয়ের কৌশলঃ

হুনাইনের যুদ্ধের পর নবীজি (সা.) যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ বণ্টন করেন। এই সম্পদের মধ্যে ছিল প্রায় ৬ হাজার বন্দী, ২৪ হাজার উট, ৪০ হাজার পশু ও ৪ হাজার পাউন্ড রুপা। তিনি নব্য মুসলিমদের, বিশেষ করে মক্কার কুরাইশদের বেশি অংশ দেন, যাতে তাদের হৃদয় ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু এই বণ্টনে আনসারদের কম অংশ দেওয়ায় তারা অসন্তোষ প্রকাশ করে। তারা মনে করে নবীজি (সা.) তাঁর আত্মীয়দের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন।

হজরত সা' দ ইবনে উবাদা (রা.) এই অসন্তোষের কথা নবীজি (সা.)–এর কাছে জানান। নবীজি (সা.) প্রথমে সা' দের নিজস্ব অবস্থান জানতে চান। সা' দ বিনয়ের সঙ্গে বলেন, 'আমি আমার কওমের একজন মাত্র।'

নবীজি (সা.) তখন আনসারদের একত্র করতে বলেন। তিনি তাঁবুতে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং বলেন, 'হে আনসাররা, আমি শুনেছি তোমরা আমার ওপর অসন্তুষ্ট। আমি কি তোমাদের পথভ্রষ্ট অবস্থায় পাইনি, আর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদের হেদায়েত দেননি? তোমরা কি দরিদ্র ছিলে না, আর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদের ধনী করেননি? তোমরা কি শত্রু ছিলে না, আর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদের হৃদয়ে মিলন ঘটাননি?'

আনসাররা বলেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সবচেয়ে দয়ালু ও মহৎ।'

নবীজি (সা.) আরও বলেন, 'তোমরা যদি বলতে, তাহলে সত্য বলতে, "তুমি আমাদের কাছে অবিশ্বাসী হয়ে এসেছিলে, আমরা তোমাকে বিশ্বাস করেছি; তুমি সাহায্যহীন হয়ে এসেছিলে, আমরা তোমাকে সাহায্য করেছি; তুমি বহিষ্কৃত হয়ে এসেছিলে, আমরা তোমাকে আশ্রয় দিয়েছি; তুমি দরিদ্র হয়ে এসেছিলে, আমরা তোমাকে সমৃদ্ধ করেছি।" হে আনসাররা, তোমরা কি সেই পার্থিব জিনিসের জন্য অসন্তুষ্ট, যা আমি কিছু লোককে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য দিয়েছি? তোমরা কি সন্তুষ্ট নও যে লোকেরা ভেড়া ও উট নিয়ে চলে যাবে, আর তোমরা আল্লাহর রাসুলকে তোমাদের বাসভূমিতে নিয়ে যাবে? আল্লাহর কসম, যদি হিজরত না হতো, আমি আনসারের একজন হতাম।'

রাসুল (সা.) শেষে দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ, আনসারদের, তাদের সন্তানদের ও তাদের সন্তানদের সন্তানদের ওপর করুণা কর।'

এই কথাগুলো শুনে আনসাররা অশ্রুসিক্ত হয়ে বলেন, ‘আমরা আল্লাহর রাসুল (সা.)–কে আমাদের ভাগ্য ও অংশ হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৪৩৩০)

এ ঘটনা থেকে আমরা শিখি যে নবীজি (সা.) সমালোচনার মুখে তিরস্কারের পরিবর্তে তাদের অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, তাদের মর্যাদা উঁচু করেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তের পেছনের দূরদর্শী কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি আনসারদের অসন্তোষের মূল কারণ–প্রত্যাখ্যাত বোধ করার অনুভূতি বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাদের ভালোবাসা ও সম্মান দিয়ে হৃদয় জয় করেছিলেন।

সমালোচনা মোকাবিলায় নবীজি (সা.)–এর কৌশলঃ সমালোচনা মোকাবিলায় মহানবী (সা.)–এর পদ্ধতি ছিল অনন্য। তিনি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতেন, তবে তাঁর প্রতিক্রিয়ার মূলে ছিল ধৈর্য, দয়া ও আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি প্রতিশ্রুতি। তাফসির ইবনে কাসিরে সুরা আল–হিজরের ব্যাখ্যায় তাঁর কয়েকটি কৌশল উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে—

১। শান্ত ও বিনয়ী প্রতিক্রিয়া: জায়েদ ইবনে সুনআহর অভদ্রতার মুখেও তিনি শান্ত থেকেছেন এবং প্রতিশোধের পরিবর্তে দয়া দেখিয়েছেন। তিনি সমালোচনাকে ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করেননি; বরং পরিস্থিতির উন্নতি করেছেন।

২। সমালোচনার মূল কারণ অনুসন্ধান: আনসারদের অসন্তোষের ক্ষেত্রে তিনি প্রথমে সা’দের মাধ্যমে তথ্য যাচাই করেন এবং তাদের অসন্তোষের প্রকৃত কারণ বোঝার চেষ্টা করেন। এটি তাঁর দূরদর্শিতা ও নেতৃত্বের গুণ প্রকাশ করে।

৩। সমালোচকদের মর্যাদা দেওয়া: আনসারদের সমালোচনার জবাবে তিনি তাদের তিরস্কার করেননি; বরং তাদের অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে তাদের মর্যাদা বাড়িয়েছেন। এটি তাদের হৃদয়ে শান্তি ও সন্তুষ্টি ফিরিয়ে এনেছে।

৪। সিদ্ধান্তের পেছনের জ্ঞান ব্যাখ্যা: তিনি আনসারদের বোঝান যে নব্য মুসলিমদের বেশি সম্পদ দেওয়ার পেছনে ছিল ইসলামের প্রতি তাদের আকর্ষণ বাড়ানোর উদ্দেশ্য। এই ব্যাখ্যা তাদের ভুল–বোঝাবুঝি দূর করে।

৫। আল্লাহর প্রশংসা ও দোয়ার আশ্রয়: অবিশ্বাসীদের ভিত্তিহীন সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহর প্রশংসা, সিজদা ও ইবাদতের মাধ্যমে হৃদয়ের শান্তি খুঁজতেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাঁকে বলেন, ‘তাহলে তোমার প্রভুর প্রশংসায় মহিমান্বিত করো এবং সিজদাকারীদের মধ্যে থেকো।’ (সুরা আল–হিজর, আয়াত: ৯৮)

সমালোচনা মোকাবেলায় নবীজির (সা) শিক্ষাঃ আজকের বিশ্বে সমালোচনা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, কর্মক্ষেত্র বা ব্যক্তিগত জীবনে আমরা প্রায়ই

অবিচারপূর্ণ বা কঠোর সমালোচনার মুখোমুখি হই। নবীজি (সা.)–এর জীবন থেকে আমরা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি—

ধৈর্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণ: সমালোচনার মুখে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে শান্ত থাকা এবং পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা।

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি: সমালোচনাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ হিসেবে না নিয়ে তা থেকে শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করা।

দয়া ও ক্ষমা: সমালোচকদের প্রতি দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শন, যা তাদের হৃদয় পরিবর্তন করতে পারে।

আল্লাহর ওপর ভরসা: কঠিন সমালোচনার সময় ইবাদত ও দোয়ার মাধ্যমে মানসিক শান্তি খোঁজা।

হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, '**তাঁর চরিত্র ছিল কোরআন**।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৭৪৬)

নবীজি (সা.) পবিত্র কোরআনের শিক্ষার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি ছিলেন। তিনি পবিত্র কোরআনের নির্দেশ—'**যা মন্দ, তা যা উত্তম, তা দিয়ে প্রতিরোধ করো**' (সুরা ফুসসিলাত, ৪১: ৩৪) নিজের জীবনে প্রয়োগ করেছেন। তাঁর প্রতিক্রিয়া প্রতিটি পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত ছিল, যা তাঁকে সম্মান ও মর্যাদার উচ্চতায় নিয়ে গেছে।

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) সমালোচনা মোকাবিলায় ধৈর্য, দয়া ও দূরদর্শিতার অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ইহুদি রাব্বির অভদ্রতার মুখে তিনি ক্ষমা ও উদারতা দেখিয়েছেন, আনসারদের অসন্তোষের সময় তাদের মর্যাদা ও ভালোবাসা দিয়ে হৃদয় জয় করেছেন। তিনি সমালোচনাকে ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ না করে তার মূল কারণ বুঝতে চেষ্টা করতেন এবং পরিস্থিতির উন্নতির জন্য কাজ করতেন। তাঁর জীবন আমাদের শেখায় যে সমালোচনা একটি সুযোগ হতে পারে—নিজেকে উন্নত করার, সম্পর্ক মজবুত করার এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের। আজকের মুসলিমদের জন্য তাঁর এই শিক্ষা একটি পথনির্দেশ, যা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়।

তথ্য সুত্রঃ মহানবী (সা.) যেভাবে সমালোচনা মোকাবেলা করতেন, ইসলাম, প্রথম আলো, লেখা:মনযূরুল হক, প্রকাশ: ০৯ মে ২০২৫

উম্মাহর দরদী নেতা নবীজি

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন-

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ . وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

বাস্তবিকপক্ষে আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন- তিনি তাদের মাঝে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদেরই মধ্য থেকে, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পবিত্র-পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। আর তারা এর পূর্বে ছিল স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৬৪

নবীজী ছিলেন উম্মতের হেদায়েত, নাজাত ও মুক্তির জন্য সদা বিভোর। উম্মতের কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁর জীবনের সবকিছু। উম্মত কীভাবে অশান্তি থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে চির শান্তি ও সফলতা লাভ করতে পারে, কীভবে কুফর শিরক ও গোমরাহী থেকে মুক্তি পেয়ে ঈমানের নূরে উদ্ভাসিত হতে পারে- এ নিয়ে ছিল তাঁর দিলে ভীষণ তড়প।

কুরআনে কারীমে নবীজীর এ অবস্থার চিত্রায়ণ হয়েছে অত্যন্ত চমৎকার ভঙ্গিমায়। আল্লাহ তাআলা প্রিয় হাবীবকে উদ্দেশ্য করে বলেন-

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ.

(হে রাসূল!) তারা ঈমান (কেন) আনছে না, এই দুঃখে মনে হচ্ছে আপনি নিজেকে শেষ করে ফেলবেন! -সূরা শুআরা (২৬) : ৩

তায়েফবাসীর চরম নিষ্ঠুরতার পরেও রহমতের নবীর দয়াই প্রবল থাকল। ফিরিয়ে দিলেন ফেরেশতা কর্তৃক তায়েফবাসীকে শাস্তি দেয়ার পস্তাব। বরং বললেন-

بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ، لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.

(না,) বরং আমি তো আশা রাখি, আল্লাহ তাআলা এদের প্রজন্মকে তাওহীদের জন্য কবুল করবেন। তারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে। তার সাথে আর কাউকে শরীক করবে না। (দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, হাদীস ৩২৩১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭৯৫)

আমাদের নবী, যিনি দুনিয়াতে উম্মতের জন্য হেদায়েতের ফিকির করেছেন। তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিতে গিয়ে যারপরনাই কষ্ট সয়েছেন। আর হাশরের ময়দানের কঠিন সেই দুর্যোগে যখন সবাই 'নফসী নফসী' করতে থাকবে তখন একমাত্র সেই নবীর যবানেই উচ্চারিত হতে থাকবে 'উম্মতী উম্মতী'। নবীজী বলেন-

لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُوهَا، فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

প্রত্যেক নবীরই একটি দুআ বিশেষভাবে কবুল হয়। সকল নবীই তা করে ফেলেছেন। কিন্তু আমি আমার সেই দুআ রেখে দিয়েছি- কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের শাফাআতের জন্যে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯৮

তথ্য সুত্রঃ আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের নাজাতই ছিল যাঁর ধ্যানজ্ঞান, লেখক মুহাম্মাদ আশিক বিল্লাহ তানভীর, মাসিক আল কাউসার বর্ষ: ১৮, সংখ্যা: ০৮, সফর ১৪৪৪, সেপ্টেম্বর ২০২২

মুসলিম নেতৃত্বের জায়গা থেকে নবিজির (ﷺ) তাওহিদের ব্যাপারে আপোষহীনতা

নবিজি মুহাম্মদ ﷺ-এর নেতৃত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তাওহিদের প্রশ্নে এক বিন্দু আপোষ না করা। তিনি প্রতিকূলতা, নির্যাতন, চাপ ও প্রলোভনের মুখেও সত্যের ওপর অটল থেকেছেন। এটাই প্রকৃত নেতৃত্ব — যে নেতৃত্ব আল্লাহর পথে, তাওহিদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, যা যুগে যুগে মুসলিম উম্মাহকে আদর্শের পথ দেখিয়ে আসছে।

কুরাইশ নেতাদের লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান: মক্কার কুরাইশ নেতারা বারবার নবিজিকে প্রস্তাব দিয়েছিল, যাতে তিনি তাওহিদের দাওয়াত বন্ধ করেন। তারা বলেছিল: "তুমি যদি রাজত্ব চাও, আমরা তোমাকে মক্কার বাদশাহ বানাব। যদি ধনসম্পদ চাও, আমরা আমাদের ধন-সম্পদ একত্র করে তোমাকে সবচেয়ে ধনী করে দেব। শুধু এই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা থেকে বিরত থাকো।"

নবিজির উত্তরে বলেন,

"আল্লাহর কসম, যদি তারা আমার এক হাতে সূর্য এবং অন্য হাতে চাঁদ রেখে দেয়, তবুও আমি এই দাওয়াত ত্যাগ করব না — যতক্ষণ না আল্লাহ এটিকে বিজয় দান করেন অথবা আমি এতে ধ্বংস হই।"

- ইবনে হিশাম, সীরাহ, খণ্ড ১, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসীর

এ ঘটনা থেকে মুসলিম নেতৃত্বের জন্য শিক্ষা হলো সত্য ও তাওহিদের পথ কখনো দুনিয়াবি লাভ, ক্ষমতা, প্রভাব বা চাপের কারণে বদলানো যাবে না।

কুরাইশদের প্রস্তাব - এক বছর তারা, এক বছর ইসলাম: কুরাইশরা একবার বলল: "আসো, আপোষ করি—এক বছর আমরা তোমার রবের ইবাদত করব, আর এক বছর তুমি আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করো।"

তখন আল্লাহ সরাসরি একটি সূরা নাজিল করেন:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ... لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

"বল, হে কাফিরগণ! ... তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আর আমার জন্য আমার ধর্ম।"

— [সূরা কাফিরুন: আয়াত ১–৬]

- সহিহ বুখারী, তাফসীর ইবনে কাসীর

  এ ঘটনা থেকে মুসলিম নেতৃত্বের জন্য শিক্ষা হলো তাওহিদের ব্যাপারে আপোষের কোনো বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। একত্ববাদের প্রশ্নে মুসলমানকে সর্বদা দৃঢ় থাকতে হবে।

তায়েফের অমানবিক নির্যাতনেও দাওয়াত বন্ধ করেননি: নবিজি (সা.) মক্কা থেকে তায়েফে যান তাওহিদের দাওয়াত নিয়ে। কিন্তু তায়েফবাসীরা তাঁকে অপমান করে, পাথর ছুঁড়ে রক্তাক্ত করে শহর থেকে বের করে দেয়। ফেরেশতা এসে বলেন: "আপনি আদেশ দিলে আমি দুই পাহাড়ের মাঝে তাদের গুঁড়িয়ে দেই।" নবিজি (সা.) বলেন: **"না, আমি চাই যে তাদের পরবর্তী প্রজন্ম হয়ত আল্লাহর ইবাদত করবে।"**
— (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৭৫৯)

একজন আদর্শ নেতা শত কষ্ট সহ্য করেন, কিন্তু দ্বীনের মূলনীতি তথা তাওহিদের দাওয়াতে কখনই ছাড় দেন না।

হিজরতের কারণও ছিল তাওহিদ প্রতিষ্ঠার স্বাধীনতা: মদিনায় হিজরতের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল তাওহিদের দাওয়াত অব্যাহত রাখা এবং শিরকমুক্ত সমাজ গঠন। কুরআনে বলা হয়েছে: **وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ**
"তাদেরকে তো একমাত্র এ জন্যই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ থেকে।"
— [সূরা বাইয়্যিনাহ: ৫]

নেতৃত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো এমন পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে তাওহিদ ও ইসলামী আকীদা অনুশীলন করা যায় মুক্তভাবে।

রাজনীতিক প্রেক্ষাপটে নবীজি (সা)

মহানবী (সা.)–এর আবির্ভাবের আগে আরবের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল নৈরাজ্যে ভরা। গোত্রভিত্তিক সমাজে ভেদাভেদই ছিল প্রধান। কলহ, যুদ্ধবিগ্রহ, হানাহানি লেগেই থাকত। কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক কেন্দ্র না থাকায় আরব সমাজ ছিল বিভক্ত। নৈরাজ্যপূর্ণ আরবে মহানবী (সা.) যে অবিস্মরণীয় রাজনৈতিক বিপ্লব সাধন করেছিলেন তা বিশ্বের ইতিহাসে বিস্ময়কর।

আল্লাহ–তাআলা ঘোষণা করেছেন, **তিনিই এ সত্তা যিনি তাঁর রাসুলকে হেদায়াত ও দীনের হকসহ পাঠিয়েছেন, যাতে আর সব দীনের ওপর একে বিজয়ী করে তোলেন। এ বিষয়ে আল্লাহ সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।** (সুরা আল ফাতহ, আয়াত: ২৮)। একই দায়িত্বের কথা তিনি সুরা তাওবা (আয়াত: ৩৩) এবং সুরা আস-সফ্ফেও (আয়াত: ৯) উল্লেখ করেছেন।

ইসলাম নামের পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানকে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্বাস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা ছিল মহানবী (সা.)–এর দায়িত্ব, যেন তা মানবসমাজের সর্বস্তরে বাস্তবায়ন হয়।

মহানবী (সা.)–র রাজনীতির লক্ষ্যঃ পূর্বে উল্লেখিত আয়াত থেকে বোঝা যায় মহানবী (সা.)–র রাজনীতি ছিল ইসলামের জন্য। ধর্মীয় চেতনাকে বদ্ধমূল করে আল্লাহ ভীরু চরিত্রবান মানুষ তৈরি করতে চেয়েছেন তিনি, যেন ধর্মীয় বিধান মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। তাহলেই সমাজের বর্বরতা ও নৈরাজ্য দূর করা সম্ভব। তাঁর রাজনীতির লক্ষ ছিল:

১. আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তাঁর নির্দেশিত আইন প্রতিষ্ঠা করা।

২. শিক্ষা, অর্থ, সমাজ, সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান পরিপালনের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

৩. মানুষে মানুষে বৈষম্য, অনাচার, অবিচার, অন্যায় দূর করে সাম্য, শৃঙ্খলা, ন্যায়বিচার ও সুষম শাসনের ব্যবস্থা করা।

৪. যোগ্য ও খোদাভীরু নেতৃত্বের মাধ্যমে সমাজ পরিচালনা করা।

৫. পরকালীন কল্যাণের পথকে সবার জন্য মসৃণ করে দেওয়া, যেন পার্থিব প্রবঞ্চনার গোলকধাঁধায় মানব জীবন বরবাদ হয়ে না যায়।

মহানবী (সা.)–র রাজনীতির বৈশিষ্ট্যঃ মহানবী (সা.)-র রাজনীতির তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল।

১. চারিত্রিক ও নৈতিক শক্তি: সকল নবীর রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁদের চারিত্রিক ও নৈতিক শক্তি। তাঁদের নিষ্কলঙ্ক দীর্ঘজীবন যে পরার্থপর পরিচয় বহন করে, তা অন্য কোথাও মেলা ভার। মহানবী (সা.)–এর রাজনীতিতে এই বৈশিষ্ট্য ছিল সমুজ্জ্বল। ফলে তাঁর নিখাঁদ চরিত্রের প্রভাবকে শুধু রাজনৈতিক কার্যকলাপের দোহাই দিয়ে প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না।

২। উপায়-উপকরণের পবিত্রতা: তিনি কোনো অন্যায় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার মতো উপায় অবলম্বন করে রাজনীতি করেননি। প্রতিপক্ষের সঙ্গে তিনি ব্যক্তিগত আক্রোশ পোষণ করতেন

না। চরম শত্রুর সঙ্গেও মানবিক আচরণ করতেন। তারা ইসলামের আদর্শ মেনে নিলে তাদের আগের সব দোষ মাফ করে দিতেন।

৩. উদ্দেশ্যের নিষ্কলুষতা: ইসলামের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা তাঁর ছিল কাম্য, ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা নয়। না হলে তিনি কুরাইশের প্রস্তাব মেনে নেতৃত্ব গ্রহণ করে নিতে পারতেন।

এই তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য স্বার্থান্বেষী ও দুনিয়াদারদের রাজনীতি থেকে মহানবী (সা.)-কে পৃথক মর্যাদা দিয়েছে।

মক্কার রাজনৈতিক পদক্ষেপ

অনুসারী গঠন: মক্কার ১৩ বছরে আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী ও আবুযর গিফারি (রা.)-র মতো বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং মক্কার ৪৩৫, মদিনার ২০০ এবং হাবশায় হিজরতকারী প্রায় ১০০ লোকসহ মোট সাড়ে সাত শতাধিক ব্যক্তিকে মহানবী (সা.) ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসেন। হিজরতের পর এই সংখ্যাটি এক বছরে প্রায় চার গুণ বেড়ে তিন হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়।

দপ্তর প্রতিষ্ঠা: মক্কায় অনুসারীদের প্রশিক্ষণ ও কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুবিধার্থে তিনি কাবা শরিফের পাশে আরকাম ইবনে আবুল আরকাম (রা.)–র বাড়িতে একটা কেন্দ্রীয় দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন। এটিকে রাজনৈতিক আশ্রয়কেন্দ্রও বলা চলে। এখানে গোপনে এসে নতুন ধর্মান্তরিতরা যাবতীয় কর্মসূচীর সংবাদ সংগ্রহ করতে পারতেন। প্রাথমিক শিক্ষা, নতুন খোদায়ি বিধান এবং নবীজির (সা.) নির্দেশনার কথাও জানতে পারতেন।

আবিসিনিয়ায় রাজনৈতিক আশ্রয়ে পাঠানো: তিনি যখন দেখলেন, তাঁর অনুসারীদের কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হচ্ছে এবং জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠেছে, তখন তাঁদের আবিসিনিয়ায় (বর্তমান ইথিওপিয়া) চলে যেতে বলেন। তিনি নিজে মক্কায় থেকে যান। সাহাবিদের ১০ জনের একটি দল (পরে তা বেড়ে ৮৩ জনে পৌঁছে) আবিসিনিয়ায় হিজরত করে সেখানে রাজনৈতিক আশ্রয় নেন। পরে মদিনা মুসলিমদের আবাসভূমি হয়ে উঠলে তারা মদিনায় চলে আসেন। আবিসিনিয়া হিজরতে মাধ্যমে কেবল কোরাইশের নিপীড়ন থেকে তাঁরা মুক্তিই পান না, ইসলামের প্রসারও হয় এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গেও মহানবী (সা.)-র অনুসারীদের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র তৈরি হয়।

মদিনাবাসীর সঙ্গে চুক্তি: হজের মৌসুমে ইয়াস্রিবের (মদিনার পুরোনো নাম) অধিবাসীরা মক্কায় এলে মহানবী (সা.) তাদের সামনে ইসলাম তুলে ধরেন। তারাও নিজেদের অনৈক্যের কথা নবীজিকে জানান। তারা আশা করেন, তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ আরব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করবেন। গভীর রাতে তারা আকাবার কাছে একটি গিরিপথে সমবেত হন। দুজন নারীসহ সংখ্যায় ছিলেন তারা ৭৩ জন। নবীজির সঙ্গে চাচা আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবও ছিলেন। তারা প্রতিশ্রুতি দেন নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদের সুরক্ষায় তারা ততটা যত্নবান নবীজির বেলায়ও ততটাই হবেন।

নবীজিও বলেন, তাদের নিঃসঙ্গ ও সহায়হীন অবস্থায় ছেড়ে না দিয়ে তাদেরই একজন হয়ে থাকবেন। তারা যার সঙ্গে যুদ্ধ করবে, তিনিও তার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন; যার সঙ্গে সন্ধি করবে, তিনিও তার সঙ্গে সন্ধি করবেন। এই প্রতিশ্রুতি মদিনায় নবীজির অবস্থান এবং ইসলামের প্রাথমিক ভিত শক্তিশালী করে দেয়।

মদিনার রাজনৈতিক পদক্ষেপঃ

প্রাথমিক জরিপ: বুখারির *কিতাবুল জিহাদ*-এ উল্লেখ আছে, দ্বিতীয় হিজরিতে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে নবীজি (সা.) মুসলিম জনগণের একটা পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করে একটি দপ্তরে সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেন। এটি একটি প্রয়োজনীয় জরিপকার্য বটে। ইতিহাসে এটিই প্রথম লিপিবদ্ধ আদমশুমারি।

মসজিদ নির্মাণ: নবীজি (সা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে (২৪ সেপ্টেম্বর, ৬২২ ইসায়ি) সর্বপ্রথম মসজিদে নববি নির্মাণ করেন। এটা একদিকে ছিল যেমন ইবাদাতের ঘর, তেমনি ছিল তার কর্মী ও সহচরদের পারস্পরিক সম্মিলনকেন্দ্রও।

আনসার ও মুহাজির ভ্রাতৃবন্ধন: মক্কা থেকে গমনকারী ও মদিনায় অভ্যর্থনাকারী উভয়পক্ষকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে তিনি একটি দূরদর্শী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন। মক্কাবাসীদের বলা হতো মুহাজির এবং মদিনাবাসী আনসার। তাদের মিত্রতা তিনি পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতার অঙ্গীকারেও বেঁধে দেন। এই ভ্রাতৃবন্ধন পরের সব সম্মিলিত কর্মতৎপরতা নির্বিবাদে এগিয়ে নিতে প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

আওস-খাজরাজের বিরোধ মীমাংসা: মদিনার প্রধান দুটি গোত্র আওস ও খাজরাজের মধ্যেও প্রায়ই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সর্বশেষ যুদ্ধ ছিল 'বুয়াস' যুদ্ধ। এ যুদ্ধটি হয় হিজরতের ৫ বছর আগে। আওস ও খাজরাজ গোত্রের বহু দিনের বিবাদ মিটিয়ে মহানবী (সা.) মদিনায় বসবাসকারী তিনটি শ্রেণির মধ্যে ঐক্য, সংহতি, সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় 'মদিনার সনদ' প্রণয়ন করেন।

মদিনা সনদ: রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুসারে 'মদিনা সনদ' পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান। মসৃণ পাতলা চামড়ায় লিখিত এ সনদটি দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর নেতাদের কাছে ছিল। পরে তা হাদিস গ্রন্থগুলোতে সংরক্ষিত হয়েছে। এতে মহানবী (সা.) কুরআনের নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে একটি লিখিত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন। এ সনদে ৪৭টি ধারা ছিল।

অন্যান্য রাজনৈতিক পদক্ষেপ: মদিনায় মহানবী (সা.)–র ১০ বছরের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বিভিন্ন বিবদমান গোত্রগুলো একটি কেন্দ্রীয় শাসনের আওতায় নিয়ে আসা, বিভিন্ন এলাকা ও গোত্রের ২০৯টি প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ ও সংলাপ, রাজনৈতিক লক্ষ্যে শতাধিক দূত প্রেরণ, তৎকালের দুই পরাশক্তি পারস্য ও রোম সম্রাটসহ চার শতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে চিঠি পাঠানো, বিদ্রোহীদের দমন, বৈরী রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা, আভ্যন্তরীণ শান্তি-

শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাসহ নানান রাজনৈতিক ও সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করেন। এর ফলাফলও এসেছিল দ্রুত। মাত্র ১০ বছরে মুসলিম জনসংখ্যা ৭০০ থেকে প্রায় ১০ লাখে উন্নীত হয়। মাত্র ছয় বর্গমাইলের ইসলামি অঞ্চলের পরিধি পৌনে ১২ লাখ বর্গমাইলে বিস্তৃতি লাভ করে। বিদায় হজেই অংশগ্রহণকারী সাহাবিদের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সোয়া লাখের ওপরে। তথ্য সুত্রঃ মহানবী (সা.)–র রাজনীতির মূল বৈশিষ্ট্য, ইসলাম, প্রথম আলো, লেখা:মনযূরুল হক, প্রকাশ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

ইনসাফ ও সাম্যের নেতা

একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থার যতগুলো দিক ও বিভাগ প্রয়োজন সেই সব দিক ও বিভাগ দিয়েই মানব সম্প্রদায়ের জন্য দ্বীন ইসলাম নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সেই সব বিভাগের একজন দক্ষ মহামানব। একজন পূর্ণাঙ্গ মহামানব হিসেবে তিনি ন্যায়পরায়ণ প্রশাসক, সাথে সাথে তিনি ন্যায়পরায়ণ প্রধান বিচারপতিও ছিলেন। দক্ষতার সাথে তিনি যেমন প্রশাসন পরিচালনা করেছেন, তেমনি তিনি ন্যায় ও ইনসাফের সাথে বিচারব্যবস্থা পরিচালনা করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন ন্যায়বিচারের পরিপূর্ণ আদর্শ। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সর্বদা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করতে গিয়ে কোনদিন নিজের আহাল, আত্মীয়-পরিজন ও জলিল-কদর কোন সাহাবীর পক্ষও অবলম্বন করেননি। তিনি বলতেন, যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতিমাও চুরি করে, তবে আমি তার বেলায়ও হাত কাটার নির্দেশ দিবো।'

একবার মাখজুমী গোত্রের এক কুরাইশী মহিলা চুরি করে ধরা পড়ে। নবী করীম (সা) তার হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। নির্দেশ শুনে লোকজন খুব পেরেশান হয়ে পড়লো। কারণ সেই মহিলা ছিল সম্ভ্রান্ত গোত্রের। তারা বলাবলি করতে লাগলো, উসামা ইবনু যায়িদ ছাড়া আর কে আছে, যাকে আল্লাহর রাসূল (সা) অত্যধিক ভালোবাসতেন। তারা উসামা (রা) কে সুপারিশের জন্য রাসূল (সা) এর কাছে পাঠালেন। যখন তিনি এ ব্যাপারে রাসূল (সা) এর সাথে কথা বললেন, তখন নবী করীম (সা) বললেন, "হে উসামা! তুমি কি আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা না করার সুপারিশ করতে এসেছো?" তখন উসামা ইবনু যায়িদ ভয় পেয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে মাফ করে দিন। আমার ভুল হয়েছে। অতঃপর নবী আকরাম (সা) মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন। প্রথমে আল্লাহর হামদ ও সানা পেশের পর বললেন, 'হে লোক সকল! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকজন এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। যখন তাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী লোক চুরি করতো তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত এবং দুর্বল লোক চুরি করলে তাকে শাস্তি দিত। ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আজ যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতিমাও চুরি করতো তবে আমি তার বেলায়ও হাত কাটার নির্দেশ দিতাম। - সহীহ বুখারী: ৩৪৭৫; সহীহ মুসলিম: ১৬৮৮

এক ইহুদি এবং এক মুসলিমের মধ্যে একটি অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। নবীজী বিষয়টি তদন্ত করে দেখেন এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে রায় দেন — রায়টি মুসলিমের বিরুদ্ধে এবং ইহুদির পক্ষে যায়।

আল্লাহ তাআলা এই উপলক্ষে আয়াত নাজিল করেন:

"হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহর জন্য দৃঢ়ভাবে ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাও — এমনকি তা যদি তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধেও হয়।"

- (সূরা আন-নিসা: ১৩৫)

এক যুদ্ধে নবীজী (সা.) সেনাদের সারিবদ্ধ করছিলেন। এক সাহাবিকে (সাওয়াদ ইবনে গাযিয়্যাহ) হালকা লাঠি দিয়ে স্পর্শ করেন। সাহাবি প্রতিবাদ করে বলেন, "আপনি আমার গায়ে আঘাত করেছেন, বদলা চাই।" নবীজী (সা.) সাথে সাথে নিজের বক্ষ উন্মুক্ত করেন এবং বলেন: "এই নাও, আমাকে আঘাত করো যেমন আমি করেছি।"

সাহাবি তখন আবেগে কাঁদতে কাঁদতে নবীজির বুকে চুমু খান এবং বলেন, "হে রাসূল! আমি চাইছিলাম আপনার দেহ মুবারকের শেষবারের মতো স্পর্শ করতে।" - ইবনে ইসহাক ও ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ৪

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, 'ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে (আরোহীর অভাবে) বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা), হজরত আলী (রা), হজরত আবু লুবাবা (রা) তিনজনই পালাক্রমে একটি উটের ওপর আরোহণ করে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে যখন রাসূল (সা)-এর উট টানার পালা আসত, তখন রাসূল (সা)-এর হুকুমে সাহাবি হজরত আলী ও আবু লুবাবা উটে আরোহণ করতেন। অতঃপর হজরত আলী ও আবু লুবাবা উট টানলে রাসূল (সা) উটে আরোহণ করতেন।' (তাবকাতে ইবনে সা'দ-২/২১)

অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নেতৃত্ব

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু একজন ধর্মীয় নেতা ছিলেন না, বরং এক আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক ও সমাজসংস্কারকও ছিলেন। মদিনায় হিজরতের পর তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই রাষ্ট্রে বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এর নেতৃত্বে অর্থনীতিতে ন্যায্যতা, দারিদ্র্য বিমোচন, বণ্টনের নীতি, সুদমুক্ত অর্থনীতি এবং কল্যাণকামী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

১. মদিনা রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা: হিজরতের পর নবীজী (সা) মদিনায় নানা শ্রেণি-পেশার, ধর্ম-বর্ণের মানুষের জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলেন। তিনি নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন:

মক্কা থেকে আগত মুহাজিরদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে আনসারদের সাথে ভাই ভাই করে দেন। এই 'মুআখাত' ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পদের ন্যায্য বণ্টন ও সামাজিক ঐক্য গড়ে ওঠে। - ইবনে হিশাম, সীরাতুন্নবী, খণ্ড **১**, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসীর

২. সুদ নিষিদ্ধ ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা: মক্কার সমাজে সুদ ছিল প্রচলিত। মদিনায় ইসলামি অর্থব্যবস্থা কায়েম করে নবীজী তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। "**আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন এবং বাণিজ্যকে হালাল করেছেন।**" - (সূরা আল-বাকারা: ২৭৫)

নবীজি (সা) প্রথম রাষ্ট্রীয় ভাবে ঘোষণা দেন, "**আমার চাচা আব্বাসের সকল সুদ আমি বাতিল করে দিচ্ছি।**" - (বিদায় হজ্বের ভাষণ – সহীহ মুসলিম)

৩. যাকাত ও সাদাকাহ – পুনর্বণ্টনের ন্যায়নীতি: নবীজী (সা) দরিদ্র ও ধনী শ্রেণির মাঝে সম্পদ বণ্টনের ভারসাম্য আনার জন্য যাকাত ফরজ করেন। যাকাতের মাধ্যমে দরিদ্র শ্রেণি, নিঃস্ব, ঋণগ্রস্ত, মুসাফির ও মজলুমদের জন্য অর্থনৈতিক সহায়তা নিশ্চিত হয়। "**তাদের (ধনীদের) ধনে রয়েছে অভাবীদের হক।**" - (সূরা আয-যারিয়াত: **১৯**)

৪. বাজার ব্যবস্থাপনা ও ন্যায্য মূল্যনীতি: রাসূলুল্লাহ (সা) মদিনায় স্বাধীন বাজার ব্যবস্থা চালু করেন, যেখানে কোন কর বা ভাড়া ছিল না (নিরপেক্ষ বাজার)। তিনি চাহিদা ও সরবরাহের ভিত্তিতে দাম নির্ধারণে হস্তক্ষেপ করতেন না, কিন্তু মজুদদারি (হোর্ডিং) ও প্রতারণা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন।

"**যে ব্যক্তি মজুদদারি করবে, সে পাপী।**" - (সহীহ মুসলিম: ১৬০৫)
"**প্রতারক ব্যক্তি আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।**" - (সহীহ মুসলিম)

৫. শ্রম ও মজুরির ন্যায়বিচার: শ্রমিকের অধিকার সম্পর্কে নবীজী বলেন: **"ঘাম শুকানোর আগেই মজুরি দিয়ে দাও।"** - (সুনান ইবনে মাজাহ: ২৪৪৩) তিনি নিজে কাঁধে খাদ্য বহন করে অভাবীদের সাহায্য করতেন (সহীহ মুসলিম)।

৬. দারিদ্র্য বিমোচনে জনকল্যাণমূলক প্রকল্প: রাসূলুল্লাহ (সা) যুদ্ধ-বন্দিদের মুক্তিপণ, ফয় (সরকারি সম্পদ) ও গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) বিতরণের ক্ষেত্রে দরিদ্রদের অগ্রাধিকার দিতেন। মসজিদে নববী ছিল কেবল ইবাদতের স্থান নয়, বরং ছিল দরিদ্রদের আশ্রয় ও সামাজিক সেবা কেন্দ্র।

নবীজীর (সা) নেতৃত্বে মদিনার ইসলামি রাষ্ট্রে একটি সুদমুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, ন্যায্য এবং কল্যাণকামী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পায়। আজকের দুনিয়ার অর্থনৈতিক সংকটের মোকাবেলায় এই নীতি ও ব্যবস্থা অনুসরণযোগ্য এক আদর্শ মডেল।

বদর যুদ্ধে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নেতৃত্ব, কৌশল ও কর্মমুখী দোআ

ইতিহাসের প্রথম ইসলামী যুদ্ধ—বদরের যুদ্ধ—মানবজাতিকে নেতৃত্ব, কৌশল ও আল্লাহর উপর প্রকৃত ভরসার এক অতুলনীয় উদাহরণ উপহার দিয়েছে। এই যুদ্ধে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু একজন রাসূল হিসেবেই নয়, বরং একজন অসাধারণ সেনাপতি এবং কর্মমুখী নেতা হিসেবেও ইতিহাসে নিজের স্থান করে নিয়েছেন। তিনি কেবল আল্লাহর সাহায্যের জন্য দোআ করেননি, বরং যুদ্ধের ময়দানে সাহাবিদের সঙ্গে প্রথম সারিতে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছেন এবং যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন।

নেতৃত্বগুণ সাহস, সহানুভূতি ও দায়িত্ব: বদরের যুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনী ছিল মাত্র ৩১৩ জন, যাদের কাছে পর্যাপ্ত অস্ত্র, রসদ বা অভিজ্ঞতা ছিল না। অপরদিকে কুরাইশ বাহিনী ছিল প্রায় এক হাজার সৈন্য নিয়ে সুসজ্জিত ও প্রশিক্ষিত। এই অসম যুদ্ধে নবীজীর নেতৃত্ব ছিল সাহসিকতা, সহানুভূতি ও পূর্ণ দায়িত্ববোধে পরিপূর্ণ।

তিনি সাহাবিদের পরামর্শ নিয়ে যুদ্ধের স্থান নির্ধারণ করেন, পানি সংগ্রহের জন্য কূপ দখল করেন এবং সেনাবাহিনীকে সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে দেন। তিনি কেবল আদেশ দেননি, বরং নিজের হাতেই তাঁবু খুঁটিয়ে বসিয়েছেন, যুদ্ধের প্রস্তুতিতে অংশগ্রহণ করেছেন এবং সাহাবিদের মনোবল বাড়িয়েছেন।

কৌশলগত প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার পূর্ণতা: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের পূর্বেই গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন এবং শত্রুপক্ষের গতি ও প্রস্তুতি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বদরের কূপগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়ে শত্রুপক্ষকে পানির সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেন—যা ছিল এক চমৎকার কৌশল।

তিনি সেনাবাহিনীকে পেছনে না রেখে নিজেই সামনের কাতারে অবস্থান নেন, যা সেনানায়ক হিসেবে তাঁর দৃঢ় নেতৃত্বগুণের প্রমাণ।

দোআর আগে বাস্তব পদক্ষেপ তথা কর্ম এবং ভরসার সমন্বয়: অনেকেই মনে করেন দোআ করলেই আল্লাহ সাহায্য পাঠাবেন, কিন্তু নবীজী আমাদের শিখিয়েছেন—আল্লাহর উপর ভরসা মানে অলস থাকা নয়, বরং সম্পূর্ণ চেষ্টা করে তারপর সাহায্য চাওয়া।

বদরের যুদ্ধের রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের ঘুমানোর আয়োজন করেন, নিজে নামাজে দাঁড়ান, আর দীর্ঘ সময় ধরে আল্লাহর কাছে সাহায্য চান। কিন্তু তার আগে:

- তিনি নিজের হাতে সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করেন,
- যুদ্ধের পরিকল্পনা করেন,
- কৌশল নির্ধারণ করেন এবং
- ময়দানে সাহসিকতার সঙ্গে উপস্থিত হন।
- যুদ্ধ শুরুর আগেই তিনি ঘোষণা দেন:

"**আল্লাহর নামে অগ্রসর হও। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরবে, সে সফল হবে।**"

তিনি যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে সাহাবিদের অনুপ্রাণিত করেন এবং শত্রুর মোকাবিলায় দৃঢ় থাকেন। তারপর যখন যুদ্ধ শুরু হয়, তখনই তিনি আল্লাহর কাছে চোখের পানি ঝরিয়ে দোআ করেন:

"**হে আল্লাহ! তুমি যদি আজ এই ছোট্ট দলকে ধ্বংস করে দাও, তবে আর কেউ তোমার ইবাদত করবে না।**"

এমন আকুতি কেবল সেই ব্যক্তি করতে পারে, যে আগে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে মাঠে নেমেছে। বদরের যুদ্ধের ঘটনায় আমরা দেখতে পাই নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল দোআ করে দায়িত্ব এড়িয়ে যাননি। বরং তিনি ছিলেন বাস্তব নেতৃত্বের মূর্ত প্রতীক। তিনি প্রথমে কাজ করেছেন, পরিকল্পনা নিয়েছেন, সাহসের সাথে ময়দানে উপস্থিত হয়েছেন এবং এরপর আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন।ন

তাঁর জীবন থেকে আমাদের শেখার আছে:

প্রথমে চেষ্টা, পরে দোআ।

প্রথমে মাঠে নামা, পরে ফলাফলের উপর ভরসা।

প্রথমে দায়িত্ব, পরে সাহায্যের আকুতি।

এই ভারসাম্যপূর্ণতাই তাঁকে করেছে ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। মুসলিম জাতির উচিত তাঁর থেকে এই বাস্তববাদী, সাহসী ও দায়িত্বশীল নেতৃত্বগুণ গ্রহণ করা এবং শুধু দোআ নয়, কাজের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা করা।

উহুদ যুদ্ধে নবিজির আত্মত্যাগ ও সাহসিকতার অনন্য দৃষ্টান্ত

উহুদের যুদ্ধ ছিল ইসলামের ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ এবং কঠিন অধ্যায়। বদরের বিজয়ের পর কাফেররা প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে বড় শক্তি নিয়ে মুসলমানদের আক্রমণ করতে আসে। এই পরিস্থিতিতে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক সাহসী ও আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন। তিনি শুধু কৌশলী রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন না; ছিলেন সম্মুখ সারির এক সাহসী যোদ্ধা, যাঁর উপস্থিতিই সাহাবিদের মাঝে চরম সাহস সঞ্চার করত।

কৌশলগত পরিকল্পনা- আক্রমণের আগেই প্রতিরোধের প্রস্তুতি:

- কুরাইশ বাহিনী প্রায় ৩,০০০ সৈন্য, ২০০ অশ্বারোহী এবং ৭০০ বর্মধারী নিয়ে মদিনার দিকে এগিয়ে আসে।
- রাসুল (সা) সাহাবিদের পরামর্শে যুদ্ধ মদিনার বাইরে উহুদের পাদদেশে করার সিদ্ধান্ত নেন — এটিই ছিল একটি আক্রমণাত্মক কৌশল।
- তিনি ৫০ জন তীরন্দাজকে উহুদের একটি পাহাড়ের ঢালে নিযুক্ত করেন (জাবাল রুমাহ) এবং নির্দেশ দেন: "যুদ্ধ শেষ হলেও তোমরা স্থান ছেড়ো না।" – (আর-রাহীকুল মাখতুম)

সম্মুখ সারিতে রাসুল (সা) এর উপস্থিতি:

রাসুল (সা) যুদ্ধের দিন বর্ম পরিধান করেন এবং মুসল্লাহ সৈন্যদের সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন। তিনি পেছনে দাঁড়িয়ে কেবল নির্দেশ দেননি, বরং স্বয়ং যুদ্ধের সম্মুখ সারিতে অংশগ্রহণ করেছেন। আলি (রা.) বলেন:

"যখন যুদ্ধ চরমে উঠত, আমরা রাসুল (সা) কে খুঁজতাম — তিনি সামনে থাকতেন।" — (মুসনাদে আহমাদ)

যুদ্ধের মাঝেও সাহস ও অটলতা: যখন মুসলিম বাহিনীর তীরন্দাজরা ভুল করে অবস্থান ত্যাগ করে, কাফেররা পিছন দিক দিয়ে মুসলমানদের আক্রমণ করে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায়:

- অনেক সাহাবি হতাশ হয়ে পিছু হটে।
- গুজব ছড়িয়ে পড়ে: "নবিজি (সা) নিহত হয়েছেন!"
- এই মুহূর্তে রাসুল (সা) সাহসের সাথে সামনে আসেন, তাঁর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়:

" أنا رسول الله، لا كذب، أنا ابن عبد المطلب"

"আমি আল্লাহর রাসুল, এতে কোনো মিথ্যা নেই; আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান!"
- (সহিহ মুসলিম, হাদিস ১৭৭৫)

ব্যক্তিগত সাহসিকতা ও আঘাত সহ্য করা:

- যুদ্ধে রাসুল (সা) নিজেও আহত হন: তাঁর চোখের নিচে রক্ত জমে যায়, দাঁত ভেঙে যায়, মুখে বর্মের কাঁটা ঢুকে যায়।
- সাহাবিরা যখন তাঁকে রক্ষা করতে আসে, তিনি তখনও পিছু হটেননি।

"তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন পাহাড়ের ঢালে, চারদিক থেকে হামলার মুখেও তিনি সাহাবিদেরকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন।" – (সিরাহ ইবনে হিশাম)

উহুদ যুদ্ধে সাহাবিদের রক্ষায় রাসুল (সা)-এর আত্মোৎসর্গ: উহুদ যুদ্ধের সবচেয়ে করুণ অথচ অনন্য সাহসিকতার একটি মুহূর্ত হলো— যখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর প্রিয় সাহাবীদের প্রাণ রক্ষার্থে নিজের জীবন বিপন্ন করে সম্মুখ সমরে দাঁড়িয়ে যান। এই ঘটনাটি ইসলামী ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে, যা রাসুল (সা) এর নিঃস্বার্থ নেতৃত্ব, সাহসিকতা ও উম্মতের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার স্পষ্ট নিদর্শন।

যুদ্ধের শুরুতে মুসলমানরা প্রাধান্য পায়। কিন্তু যখন তীরন্দাজদের একটি দল রাসুল (সা) এর নির্দেশ অমান্য করে পাহাড় ছেড়ে নিচে নামে, তখন পিছন দিক থেকে কুরাইশ বাহিনী মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুসলিম বাহিনী বিশৃঙ্খলায় পড়ে যায়। অনেকে রাসুল (সা) এর শহীদ হওয়ার গুজবে হতবাক হয়ে পড়ে।

সেই মুহূর্তে রাসুল (সা) পিছু হটার পরিবর্তে সামনে এগিয়ে আসেন। তিনি কিছু সাহাবিকে সাথে নিয়ে কাফেরদের রুখে দাঁড়ান, যেন তাঁর জীবন দিয়ে হলেও উম্মতের প্রাণ বাঁচাতে পারেন। ইবনে হিশাম বর্ণনা করেন: "রাসুল (সা) যখন বুঝলেন কাফেররা তাঁকে টার্গেট করেছে, তখন তিনি সাহাবিদের বললেন: '**তোমরা আমার চারপাশে ঢাল হয়ে দাঁড়াও।**' তিনি তাঁদের রক্ষা করতে করতে নিজেই রক্তাক্ত হন।"
— (সিরাতে ইবনে হিশাম, খণ্ড ৩)

"الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ"...

"আহতের পর যারা আল্লাহ ও রাসুলের আহ্বানে সাড়া দেয়..."
— *(সূরা আলে ইমরান: ১৭২)*
এটি সেই মুহূর্তকে ইঙ্গিত করে, যখন রাসুল (সা) আহত হয়েও যুদ্ধের মাঠ ত্যাগ না করে উম্মতের জন্য লড়ে যান।
উহুদের যুদ্ধ আমাদের শিখায়—একজন সৎ, সাহসী ও দূরদর্শী নেতা কীভাবে শত্রুর মোকাবিলা করে। রাসুলুল্লাহ (সা) এর নেতৃত্বে থাকা মানে ছিল সাহস, আত্মবিশ্বাস ও ঈমানের সর্বোচ্চ প্রকাশ। যুদ্ধের প্রতিকূল অবস্থায় তাঁর দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও আত্মত্যাগ মুসলমানদের চিরন্তন অনুপ্রেরণার উৎস।

যুদ্ধ শেষে কাফেরদের মানসিক ভীতি: যুদ্ধ শেষে আবু সুফিয়ান বিজয় দাবি করলেও তিনি মদিনা আক্রমণ করতে সাহস পাননি। রাসুল (সা) পরদিন আহত অবস্থায়ও সাহাবিদের নিয়ে কাফেরদের পশ্চাদ্ধাবন করেন — এটিই ছিল তাঁর **আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির চূড়ান্ত প্রকাশ**।
উহুদ যুদ্ধ শেষে আবু সুফিয়ান (তৎকালীন কুরাইশ বাহিনীর নেতা) মুসলিমদের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেছিলেন: "আসেন, আবার দেখা হবে বদর এলাকায় আগামী বছরে!" - (সূত্র: ইবনে হিশাম, সীরাহ, খণ্ড ৩)
কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, পরের বছর বদর সাগরী যুদ্ধের সময় আবু সুফিয়ান মক্কা থেকে রওনা হলেও মদিনা পর্যন্ত না গিয়ে অজুহাতে ফিরে যান।
তিনি বলেন: "এ বছর দুর্ভিক্ষ চলছে, যুদ্ধের উপযোগী নয়।" - (ইবনে কাসীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ৪)
এই আচরণ প্রমাণ করে যে উহুদের পরও রাসুল (সা) ও মুসলমানদের প্রতি ভীতি তাদের মনে গভীরভাবে প্রোথিত ছিল।
উহুদ যুদ্ধ শেষে পরদিন রাসুল (সা) কিছু সাহাবিদের নিয়ে বের হন হামরাউল আসাদ পর্যন্ত কাফেরদের পশ্চাদ্ধাবন করতে। মুসলমানরা তখনও রক্তাক্ত, আহত, ক্লান্ত — তবুও কাফেরদের পিছু ধাওয়া করা হয়।
কুরআনের ভাষায়,

"الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ... فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ"...

"যারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পরও আল্লাহ ও রাসুলের ডাকে সাড়া দিয়েছিল... তারা ফিরে আসে নিরাপদে, আর কোনো ক্ষতি তাদের ছুঁতে পারেনি।"

— সূরা আলে ইমরান: **১৭২–১৭৪**

এই আয়াতে রাসুল (সা) এর সেই পদক্ষেপের কথা বলা হচ্ছে, যা আত্মরক্ষামূলক হলেও শত্রুদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেয়। - (তাফসীর ইবনে কাসীর)

খন্দকের যুদ্ধ ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধ কৌশল ও নেতৃত্বগুণ

খন্দকের যুদ্ধ বা আহজাবের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই যুদ্ধ হিজরী পঞ্চম সালে সংঘটিত হয়, যখন মক্কার কুরাইশরা ইহুদি গোত্র এবং আরও কিছু আরব গোত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি বিশাল জোট গঠন করে। এই জোটবাহিনীর লক্ষ্য ছিল মদীনাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেওয়া।

এমন সংকটময় সময়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসাধারণ নেতৃত্ব ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। যুদ্ধের জন্য তিনি সরাসরি আক্রমণের পরিবর্তে প্রতিরক্ষামূলক কৌশল গ্রহণ করেন। সাহাবি সালমান ফারসির পরামর্শ অনুযায়ী মহানবী (সা) শহরের চারপাশে একটি গভীর খাল খননের সিদ্ধান্ত নেন। এই খাল এত গভীর ও প্রশস্ত ছিল যে শত্রু বাহিনী এর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে পারেনি। এটি ছিল আরব অঞ্চলে এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের যুদ্ধ কৌশল।

তিনি নিজ হাতে সাহাবাদের সঙ্গে খাল খননে অংশগ্রহণ করেন, যা তাঁর বিনয়, নেতৃত্ব এবং সাহসিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই কাজ সাহাবাদের মনোবল দৃঢ় করেছিল। তিনি সেনাবাহিনীর মনোবল বাড়াতে আল্লাহর প্রতি আস্থা ও তাওয়াক্কুলের শিক্ষা দেন। এই যুদ্ধের সময় তিনি প্রতিটি সৈনিককে গুরুত্ব দেন, তাদের মতামত গ্রহণ করেন এবং তাদের মনের সাহস বৃদ্ধিতে সদা সচেষ্ট ছিলেন।

মহানবীর (সা) কৌশলী নেতৃত্বের ফলে বিশাল শত্রুবাহিনী মদীনায় প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয় এবং শেষ পর্যন্ত দিকভ্রান্ত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। যুদ্ধটি মুসলমানদের জন্য ছিল একটি বিশাল মনোবল বৃদ্ধিকারী ঘটনা।

বনু কুরাইযা ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কৌশলী নেতৃত্ব

ইসলামের ইতিহাসে বনু কুরাইযার ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। খন্দকের যুদ্ধ চলাকালীন, যখন মুসলমানরা বহিরাগত শত্রুর মোকাবিলায় ব্যস্ত, তখন মদীনার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এক বড় প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। মদীনার ইহুদি গোত্র বনু কুরাইযা, যাদের সঙ্গে মুসলমানদের এক শান্তিচুক্তি ছিল, তারা সেই চুক্তি ভঙ্গ করে শত্রুপক্ষের সঙ্গে গোপনে হাত মেলায়। এই বিশ্বাসঘাতকতা মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্বের জন্য ভয়ানক হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এই সম্ভাব্য বিশ্বাসঘাতকতার খবর পান, তখন তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সত্যতা যাচাই করার জন্য গোয়েন্দা প্রেরণ করেন। তিনি সাহাবী সা' দ ইবনে মুআয (রাঃ), সা' দ ইবনে উবাদা (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) এবং খাওয়াত ইবনে জুবায়র (রাঃ)-কে পাঠান। এই প্রতিনিধিদল গোপনে বনু কুরাইযার নেতাদের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হন যে তারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।

এই পর্যায়ে মহানবী (সা) তাঁর অসাধারণ নেতৃত্ব গুণের পরিচয় দেন। তিনি মদীনার মুসলমানদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়া ঠেকান, সেনাবাহিনীর মনোবল ধরে রাখেন এবং একই সময়ে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন।

কৌশলগত ধৈর্য ও সামরিক কৌশলঃ খন্দকের যুদ্ধ শেষে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেরি না করে বনু কুরাইযার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি সাহাবীদের নিয়ে তাদের ঘিরে ফেলেন এবং ২৫ দিন পর্যন্ত অবরোধে রাখেন। এই সময় তিনি সরাসরি আক্রমণের পথে না গিয়ে ধৈর্য ও চাপের মাধ্যমে তাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন।

বনু কুরাইযা অবশেষে আত্মসমর্পণ করে। তবে মহানবী (সা) নিজে তাদের রায় দেননি, বরং বনু আওস গোত্রের নেতা সা' দ ইবনে মুআয (রাঃ)-এর হাতে বিচারভার দেন, যিনি উভয় পক্ষের প্রতি সুবিচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

নেতৃত্বগুণ ও নৈতিকতাঃ এই পুরো ঘটনার মধ্যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বের কয়েকটি দিক বিশেষভাবে ফুটে ওঠে:

- ❖ সতর্ক দৃষ্টি ও গোয়েন্দা ব্যবস্থাপনা – শত্রুতা প্রকাশ পাওয়ার আগেই পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা নেওয়া।
- ❖ চুক্তির প্রতি গুরুত্ব – চুক্তিভঙ্গকারীর সঙ্গে কঠোর আচরণ, অথচ নিজের পক্ষ থেকে চুক্তির প্রতি পূর্ণ আনুগত্য।
- ❖ সামরিক ধৈর্য ও চাপ কৌশল – রক্তপাত এড়িয়ে অবরোধের মাধ্যমে শত্রুকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা।

- ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা – নিজে রায় না দিয়ে একজন নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য সাহাবীর মাধ্যমে বিচার করানো।
- সাহাবীদের মনোবল ধরে রাখা – যুদ্ধশেষে পরিশ্রান্ত সাহাবীদের সঙ্গে আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে সক্ষম হওয়া।

মক্কা বিজয়ী নেতার অনন্য নেতৃত্বের নিদর্শন

ইতিহাসের পাতায় মক্কা বিজয় একটি যুগান্তকারী ঘটনা। হিজরতের আট বছর পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কৌশলে মক্কা জয় করেন, তা কেবল একটি সামরিক সাফল্যই ছিল না; বরং তা ছিল চূড়ান্ত নৈতিক বিজয়। তিনি যেভাবে বিজয়ের পরও ক্ষমা, সহনশীলতা ও ন্যায়ের পরিচয় দিয়েছেন, তা আজও বিশ্বনেতাদের জন্য আদর্শ।

মক্কা বিজয়ের পটভূমি: মদিনায় অবস্থানকালে কুরাইশদের সাথে 'হুদাইবিয়ার সন্ধি' (৬ হিজরি) হয়। কিন্তু কুরাইশদের মিত্র বনি বকরের একদল লোক মুহাম্মদ (সা) এর মিত্র বনি খুযা'আ-র উপর হামলা করে সন্ধি ভঙ্গ করে। ফলে ৮ হিজরির রমজান মাসে নবীজী (সা) ১০,০০০ সাহাবিকে সাথে নিয়ে মক্কামুখী হন। - ইবনে হিশাম, আস-সীরাহ আন-নবাবিয়্যাহ, খণ্ড ২, বুখারী ৪২৮০

নেতৃত্ব ও কৌশল: নবীজী (সা) মক্কা অভিমুখে গোপনভাবে অগ্রসর হন। রাস্তায় একাধিক মনোবিজ্ঞানভিত্তিক কৌশল প্রয়োগ করেন যেমন:

- সেনাবাহিনীকে বিভক্ত করে বিভিন্ন দিক দিয়ে প্রবেশ করানো
- রাতে আগুন জ্বালিয়ে শত্রুপক্ষকে বিভ্রান্ত করা
- আবু সুফিয়ানকে নিরাপত্তার বার্তা দিয়ে আত্মসমর্পণে উৎসাহিত করা

- (ইবনে কাসির, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ৪)

ক্ষমা ও সহনশীলতা: মক্কা বিজয়ের পর যেসব মানুষ একসময় তাঁকে ও তাঁর সাহাবীদের উপর নিপীড়ন করেছিল, তাদের প্রায় সবাইকে তিনি ক্ষমা করে দেন। রাসূলুল্লাহ (সা) কাবা শরীফে প্রবেশ করে তাওহীদের প্রচার করেন এবং বলেন: "আমি আজ তোমাদেরকে সেই কথা বলছি, যেটা ইউসুফ (আ.) তার ভাইদের বলেছিলেন: 'আজ তোমাদের প্রতি কোনো অভিযোগ নেই, তোমরা সবাই মুক্ত।'" -(সীরাত ইবনে হিশাম, খণ্ড ২))

এটি নবীজির অনন্য নেতৃত্বের নিদর্শন — প্রতিশোধ নয়, বরং ক্ষমার মাধ্যমে সমাজ পুনর্গঠন।

শাতিমদের ব্যাপারে আপোষহীন : রাসূলুল্লাহ (সা) সাধারণ মুশরিক, কাফির এমনকি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী শত্রুপক্ষকে পর্যন্ত ক্ষমা করেন, কিন্তু যারা আল্লাহর রাসূলের সম্মানহানিকর আচরণ করেছিল এবং অবমাননাকর কথা-গান ছড়িয়েছিল, তাদের তিনি ক্ষমা করেননি। তারা ছিল শাতিম ও চরম অপরাধী। রাসূলুল্লাহ (সা) কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা করার

নির্দেশ দেন, যদিও তারা কাবার গিলাফ আঁকড়ে ধরেছিল। এটি শিখায় যে, ইসলাম ক্ষমা করে, কিন্তু রাসূলের সম্মানের প্রশ্নে কোনো আপস করে না।

পরিণতি ও প্রভাব: মক্কা বিজয়ের ফলে ইসলাম দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং আরব উপদ্বীপের অধিকাংশ গোত্র স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে। এটি ইসলামের প্রতিষ্ঠাকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তিকে দৃঢ় করে। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাধারণ ক্ষমা ছিল মহানুভবতার দৃষ্টান্ত। তবে কিছু অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য — যেমন শাতিমে রাসূল হওয়া। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে নবী করীম (সা) এর সম্মান রক্ষার বিষয়টি কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা এই ঘটনাগুলো থেকে স্পষ্ট হয়। নবীজী (সা) মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে কেবল বিজয় অর্জন করেননি, বরং ইব্রাহিম (আ.)-এর সুন্নাহ মূর্তিবিরোধী তাওহীদের শিক্ষা পুনর্জাগরিত করেন। এটি ছিল শিরকের উপর তাওহীদের চূড়ান্ত বিজয় এবং মিল্লাতে ইব্রাহিমের পূর্ণ বাস্তবায়ন।

রাসুল (সা) এর ব্যক্তিগত সাহসিকতা ও বীরত্ব

নবিজির উপস্থিতি নিজ অনুসারীদের সাহস যোগাতো, আর শত্রুদের মনোবল ভেঙে দিতো। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন: "যখন যুদ্ধের সময় ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হতো, আমরা নবিজিকে খুঁজতাম। আমরা তাঁকে পেতাম সম্মুখ সারিতে। সবচেয়ে সাহসিকদের মাঝে।" — (সিরাতে ইবনে হিশাম, খণ্ড ৩)

বদরের ময়দানে তিনি সবার আগে সাহসের সাথে সামনে দাঁড়ান। ওহুদের সংকটে সাহাবিরা পিছিয়ে গেলে তিনি নিজে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন। খন্দকে শত্রুর অবরোধেও তিনি সাহস হারাননি বরং সাহাবিদের উৎসাহ দেন।

হুনাইনের যুদ্ধে শুরুতে মুসলিম বাহিনী কিছুটা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। অনেকে পিছু হটেন। সেই সময় রাসুল (সা) তাঁর খচ্চরের পিঠে থেকে সামনে এগিয়ে যান এবং গর্জে উঠেন:

"أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب"

"আমি নবী, এতে কোনো মিথ্যা নেই। আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর।"— (সহিহ মুসলিম: ১৭৭৫)

কাফেরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চারে নবিজির ভূমিকা

রাসুল (সা) এর ঈমান, সাহস, চরিত্র, কৌশল ও আল্লাহর ওপর নির্ভরতা এমন এক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল, যা কাফেরদের ভেতর ভীতি ও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর নেতৃত্ব শুধু বাহ্যিক অস্ত্রের ওপর নির্ভরশীল ছিল না, বরং আল্লাহপ্রদত্ত মর্যাদা ও সচ্চরিত্রের মাধ্যমে কাফেরদের মনোবল ভেঙে দিতো।

নবিজি মুহাম্মাদ (সা) এর নেতৃত্বে এমন এক ঈমানি শৌর্যবীর্য প্রকাশ পায়, যা শত্রুদের অন্তরজগতে ভয়, দুশ্চিন্তা ও দুর্বলতা সৃষ্টি করত। তিনি ছিলেন এমন এক নেতা, যাঁর কণ্ঠের ধ্বনি, যাত্রার সংবাদ, এমনকি ছায়াও কাফেরদের মনোবলকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিত। এই ভীতির শিকড় ছিল তার তাওয়াক্কুল, সাহস, কৌশল ও নৈতিক দৃঢ়তা।

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ

“**আমি অচিরেই কাফেরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করব।**” — (সূরা আলে ইমরান: ১৫১)

এই আয়াতটি উহুদের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নাজিল হয়। যদিও মুসলিমরা সংখ্যায় কম এবং কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবুও কাফেরদের অন্তরে ভয় এতটাই ছড়িয়ে পড়ে যে তারা বিজয় নিশ্চিত করতে চাইল না।

উহুদ যুদ্ধে আরেকটি ঘটনা ঘটে মক্কার প্রসিদ্ধ কাফের উবাই ইবনে খালাফের সঙ্গে। যুদ্ধ শেষে আহত নবীজিকে (সা) নিয়ে পর্বতের ঘাঁটিতে ছিলেন আবু বকর, ওমর, আলী, তালহা ও যুবাইর প্রমুখ সাহাবি (রা.)। সে সময় উবাই ইবনে খালাফ সেখানে পৌঁছে বলল, মুহাম্মাদ, এ যাত্রা তুমি বেঁচে গেলেও তোমার নিস্তার নেই। মুসলমানেরা বললেন, আল্লাহর রসুল, লোকটিকে সহানুভূতি দেখানো কি আমাদের উচিত হবে? নবীজি (সা) বললেন, ওকে আসতে দাও। সে কাছে এলে নবীজি (সা)হারেস ইবনে সিম্মারের কাছ থেকে একটি বর্শা নিলেন। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, বর্শা হাতে নিয়ে নবীজি (সা)এমন ভীতিকর প্রভাব দেখালেন যে, উট প্রবল জোড়ে নড়ে উঠলে তার পিঠে বসা বিষাক্ত ভিমরুলের ঝাঁক যেমন ছত্রভঙ্গ হয়ে উড়ে যায়, আমরাও ঠিক তেমনি ভয়ে তাঁর কাছ থেকে দূরে সটকে পড়লাম। নবীজি (সা)উবাইয়ের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তার শিরস্ত্রাণ ও গায়ের বর্মের মধ্যে সামান্য একটু যে জায়গা ফাঁকা ছিল, সেখানে বর্শার আঘাত হানলেন। তাতেই উবাই ইবনে খালাফ তার ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ল এবং বেশ কয়েকবার গড়াগড়ি খেল। এর আগে উবাই মক্কায় নবীজির(সা) সাথে দেখা হলেই বলত, মুহাম্মাদ, আমার একটা ঘোড়া আছে। তার নাম ‘আওজ’। তাকে আমি প্রতিদিন ৪০ কেজি ভুট্টা খাওয়াই। এই ঘোড়ায় চড়ে একদিন তোমাকে হত্যা করব।

নবীজি (সা) একদিন জবাব দিয়েছিলেন, বরং আল্লাহ চান তো আমিই তোমাকে হত্যা করব।

উবাইয়ের কাঁধে জখমটি তেমন গুরুতর না হলেও তা দিয়ে রক্ত ঝরছিল। সে কুরাইশদের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ আমাকে হত্যা করেছে।

কুরাইশরা বলল, আসলে তুমি অতিমাত্রায় ঘাবড়ে গেছ। জখম সামান্য। তোমার কোনো ভয় নেই।

সে বলল, মক্কায় থাকাকালেই মুহাম্মাদ আমাকে বলেছিল, তোমাকে আমিই হত্যা করব। আমার আশঙ্কা, সে যদি আমার প্রতি শুধু থুথুও নিক্ষেপ করে তা হলেও আমি মরে যাব। কুরাইশরা তাকে নিয়ে মক্কায় রওয়ানা হলে পথিমধ্যে সারেফ নামক স্থানে সে মারা যায়। (ইবনে হিশাম, উহুদ যুদ্ধ অধ্যায়, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯)

এক মাস আগেই ভয়ের বাতাস: রাসুলুল্লাহ (সা) বলেন:

"আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যেগুলো আমার পূর্ববর্তী নবীদের দেওয়া হয়নি....এর একটি হলো — শত্রুর অন্তরে আমার আগমনের এক মাস আগেই ভয় সঞ্চার করা হয়।"

— (সহিহ বুখারী: ২৯৭৭, সহিহ মুসলিম: ৫২১)

রাসুল (সা) এর নাম ও আগমনের খবরই শত্রুদের মনোবলে আঘাত হানত। তারা যুদ্ধে আসার আগেই মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ত।

নবিজি (সা) এর রাজনৈতিক কর্তৃত্বে কাফেরদের উদ্বিগ্নতা: নবিজির (সা) শাসন ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কাফেররা মদিনার দিকে চোখ রাখতে সাহস পেত না। মদিনার কৌশলগত অবস্থান ও রাসুল (সা) এর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা কাফেরদের জন্য চরম উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মদিনায় রাসুল (সা) ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার পর কাফেররা বুঝে যায়,

- এটি সামান্য ধর্ম প্রচারের বিষয় নয় — বরং এক আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব গড়ে উঠছে।
- মদিনা সনদের মাধ্যমে রাসুল (সা) ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভ করেন।
- কুরাইশ নেতারা আতঙ্কে পড়ে যে, এটি তাদের তাগুতিক নেতৃত্বের অবসান ঘটাতে পারে।

“মদিনা ইসলামি শাসনের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মক্কার কাফেরদের ভীতির নতুন অধ্যায় শুরু হয়।” - (আর-রাহীকুল মাখতুম)

তাবুক যুদ্ধে কাফেরদের পিছু হটা: তাবুক যুদ্ধ ছিল কাফেরদের ভয় আর মুসলিমদের ঈমানের এক পরীক্ষার ক্ষেত্র। রোমান সাম্রাজ্য যখন আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তাবুক যুদ্ধে বিশাল রোমান বাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার জন্য রাসুল (সা) ৩০,০০০ সৈন্য নিয়ে রওনা হন।

তবে রাসুল (সা) এর কৌশল, প্রস্তুতি ও ঈমানী প্রভাব এতটাই প্রবল ছিল যে রোমানরা যুদ্ধ না করেই পিছু হটে। রাসুল (সা) এর আগমন আর ঈমানি শক্তির সামনে তারা যুদ্ধ না করেই পরাজয় মেনে নেয়।

“তাবুক ছিল এমন এক বিজয়, যা কেবল ভীতির মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছিল — তরবারি ছাড়াই।” -(ইবনে কাসীর)

“তাবুকের প্রেক্ষাপটে কাফেরদের মানসিকভাবে পরাজিত হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল মুহাম্মাদ (সা) এর নাম শুনেই তাদের অন্তরে ভয় সৃষ্টি হওয়া।” - (আর-রাহীকুল মাখতুম)

রাসুলুল্লাহ (সা) এর নেতৃত্বে এমন এক ঈমানি শক্তির প্রকাশ ঘটেছিল, যার ফলে শত্রুপক্ষ কোনো বড় যুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ত।

নবীজির নেতৃত্বে বৈশ্বিক দাওয়াত ও জিহাদের সুচনা

মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত দাওয়াত ছিল মূলত স্থানিক, নির্যাতনমুখী ও আত্মরক্ষামূলক। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর নবীজির ﷺ নেতৃত্বে মুসলিম উম্মাহ নতুন এক পর্যায়ে প্রবেশ করে—যেখানে দাওয়াতের পরিধি বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হয় এবং জিহাদ কেবল প্রতিরক্ষা নয়, বরং ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও তাওহিদের প্রচারে পরিণত হয়।

মক্কা বিজয়ের পর নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর নেতৃত্বে মুসলিম রাষ্ট্রের ক্রমাগত সম্প্রসারণ ও অন্যান্য জাতির উদ্দেশে জিহাদি কাফেলা প্রেরণ ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশ্বিক দাওয়াত ও রাজনৈতিক শক্তির সুস্পষ্ট প্রতিফলন। এই পদক্ষেপগুলো কেবল সামরিক অভিযান ছিল না, বরং ইসলামের একত্ববাদ (তাওহিদ) প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সুপরিকল্পিত কৌশলও ছিল।

মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে কাবা শরিফকে শিরকমুক্ত করে নবিজি ﷺ একত্ববাদের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করেন। এরপরই তিনি ঘোষণা দেন: **"সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হবারই উপযুক্ত।"** *—সূরা ইসরা: ৮১*

এই বিজয়ের পর ইসলাম একটি রক্ষণাত্মক থেকে আক্রমণাত্মক দাওয়াতি কৌশলে রূপান্তরিত হয় — কারণ সমাজ ও রাষ্ট্র উভয়ই তখন নবিজি ﷺ-এর নিয়ন্ত্রণে আসে।

মক্কা বিজয়ের পর নবী ﷺ-এর জিহাদি কাফেলা প্রেরণের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম নিচে তুলে ধরা হলো:

বিভিন্ন গোত্রের উদ্দেশে দাওয়াত ও ইসলামের প্রসার: মক্কা বিজয়ের পর নবী ﷺ বিভিন্ন গোত্র ও অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

- বনু তামীম গোত্রের উদ্দেশে উয়ায়না বিন হিসন ফাযারীর নেতৃত্বে ৫০ জনের একটি দল প্রেরণ করা হয়। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল ওই গোত্রের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো এবং তাদেরকে ইসলামের প্রতি আগ্রহী করা। - ইবনে সাদ, *তাবাকাতুল কুবরা,* আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসীর
- বনু জাযীমাহ গোত্রের উদ্দেশে খালেদ বিন ওয়ালীদের নেতৃত্বে ৩৫০ জনের একটি দল প্রেরণ করা হয়। এই অভিযানে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়, যদিও কিছু ভুল বোঝাবুঝির কারণে সংঘর্ষ ঘটে। - *সহিহ বুখারী,* হাদিস ৪৩৩৯, ইবনে হিশাম, সীরাহ, খণ্ড ৪

রোমক ও পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতি চ্যালেঞ্জ: মক্কা বিজয়ের পর নবী ﷺ রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও পারস্য সম্রাট কিসরার প্রতি ইসলামের দাওয়াত পাঠান। এর মধ্যে:

- রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে একটি চিঠি পাঠানো হয়, যাতে তাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।
  "ইসলাম গ্রহণ করো, তুমি নিরাপদ থাকবে। আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দিবেন।"
  — নবিজি ﷺ-এর চিঠি (সহিহ বুখারী, হাদিস ৭, ইবনে কাসীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া)
- পারস্য সম্রাট কিসরাকে একটি চিঠি পাঠানো হয়, যাতে তাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। কিসরা চিঠি ছিঁড়ে ফেলেন। নবিজি ﷺ বলেন:
- **"যেমন সে আমার চিঠি ছিঁড়েছে, আল্লাহ তার সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন করবেন।"**
  - মুসনাদ আহমদ, হাদিস **১৯৫৫**,আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ৫
- মিশরের রাজা, আবিসিনিয়ার বাদশাহ, বাহরাইনের শাসক, ইমাম হিময়ার ইত্যাদি সবার কাছেই দাওয়াতি চিঠি পাঠানো হয়। *নে সাদ*, তাবাকাত,*আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইবনে কাসীর

তাবুক যুদ্ধ - প্রতিরক্ষার পরিবর্তে আগ্রাসী অবস্থান: রোমান সাম্রাজ্যের হুমকির প্রেক্ষিতে নবিজি ﷺ বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে তাবুক পর্যন্ত অগ্রসর হন। উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম রাষ্ট্রের শক্তি ও দাওয়াতের বার্তা পৌঁছানো। এ যুদ্ধে কারও সঙ্গে যুদ্ধ না হলেও অনেক গোত্র আত্মসমর্পণ করে। - তাফসীর ইবনে কাসীর, সূরা তাওবা, ইবনে হিশাম, খণ্ড ৪

এই পদক্ষেপগুলো ছিল ইসলামের বৈশ্বিক দাওয়াত ও নবী ﷺ-এর নেতৃত্বের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রতিফলন।

এই ঘটনাগুলো থেকে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি:

ইসলামের বৈশ্বিক দাওয়াত: নবী ﷺ-এর এই পদক্ষেপগুলো প্রমাণ করে যে, ইসলাম কেবল একটি অঞ্চলের ধর্ম নয়, বরং এটি সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি দাওয়াত।

নেতৃত্বের দূরদর্শিতা: নবী ﷺ-এর নেতৃত্বের মাধ্যমে আমরা শিখি যে, একটি শক্তিশালী ও সুসংগঠিত নেতৃত্বই একটি রাষ্ট্রকে সফলতার দিকে পরিচালিত করতে পারে।

ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক: ইসলামের দাওয়াত ও রাষ্ট্র পরিচালনার মধ্যে একটি সুসংগত সম্পর্ক বিদ্যমান, যা নবী ﷺ-এর কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

বৈশ্বিক জিহাদ - শুধু যুদ্ধ নয়, দাওয়াতের কৌশল: ইসলামে "জিহাদ" শব্দটি বহুস্তরবিশিষ্ট একটি শব্দ। সাধারণভাবে এটি যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও, প্রকৃতপক্ষে এটি একটি ব্যাপক কৌশলগত দাওয়াতি প্রচেষ্টা যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে — তাওহিদের প্রচার, সত্যের প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং বিশ্বমানবতার কল্যাণ সাধন।

নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর নেতৃত্বে জিহাদের যে বৈশ্বিক রূপ শুরু হয়, তা ছিল শান্তিপূর্ণ দাওয়াত, কূটনৈতিক বার্তা এবং সামরিক অভিযানের যৌগিক পন্থা।

নবী ﷺ জিহাদকে কেবল তরবারির যুদ্ধ হিসেবে ব্যবহার করেননি—তিনি এর মাধ্যমে:

- অন্যায় প্রতিরোধ
- ইসলাম রক্ষায় আত্মরক্ষা
- ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা
- ইসলামবিরোধী রাষ্ট্রশক্তিকে চ্যালেঞ্জ
- কাফির নেতাদের কাছে সরাসরি তাওহিদের বার্তা পৌঁছে দেন

মক্কা বিজয়ের পর নবী ﷺ-এর নেতৃত্বে মুসলিম রাষ্ট্রের ক্রমাগত সম্প্রসারণ ও অন্যান্য জাতির উদ্দেশে জিহাদি কাফেলা প্রেরণ ছিল ইসলামের বৈশ্বিক দাওয়াত ও রাজনৈতিক শক্তির সুস্পষ্ট প্রতিফলন। এই পদক্ষেপগুলো থেকে আমরা ইসলামের বৈশ্বিক দাওয়াত ও জিহাদ, নেতৃত্বের দূরদর্শিতা এবং ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

উপসংহার

ইব্রাহিম (আ.)-এর মিল্লাতের মূল ভিত্তি ছিল তাওহীদ, শিরকমুক্ত ধর্মজীবন, আত্মত্যাগ এবং আল্লাহর জন্য কুরবানি। কিন্তু কালের বিবর্তনে এই বিশুদ্ধ মিল্লাত হারিয়ে যায় মূর্তিপূজা, শিরক, জুলুম ও সমাজের বিভ্রান্ত মতবাদে। সেই অন্ধকার সময়ে আল্লাহ প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা) কে পাঠালেন, যিনি মক্কার বিখ্যাত কাবাঘরকে মূর্তিমুক্ত করলেন এবং ঘোষণা দিলেন: "**সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে**" (সূরা আল-ইসরা: ৮১)।

নবীজী কাবাঘরে প্রবেশ করে ইব্রাহিম (আ.)-এর রেখে যাওয়া কিবলাকে শিরকমুক্ত করলেন এবং মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলে দিলেন — এ ছিল "মিল্লাতে ইব্রাহিম"-এর সুন্নাহর পুনর্জাগরণ। তিনি প্রচার করলেন ইব্রাহিমী চেতনা, যেখানে আত্মসমর্পণ ছিল শুধুই আল্লাহর প্রতি, এবং মানবসভ্যতার জন্য একটি শিরকমুক্ত, ইনসাফপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা কায়েম ছিল লক্ষ্য।

নবী মুহাম্মাদ (সা) ছিলেন শুধু সমাজ সংস্কারক বা শান্তির বার্তাবাহকই নন — বরং তিনি ছিলেন যুদ্ধের নবী, সংগ্রামী ও কৌশলী এক সেনানায়ক। আল্লাহ তাঁকে শুধু দাওয়াতের জন্য নয়, বরং তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও বাতিল প্রতিরোধের জন্য তরবারিসহ পাঠিয়েছেন।

তিনি প্রায় ২৭টি গাযওয়ায় অংশগ্রহণ করেন, এবং সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে ইসলামের বিজয়কে বিস্তৃত করেন। বদর, উহুদ, খন্দক, হুনাইন, তাবুক — সবগুলো যুদ্ধ ছিল কেবল প্রতিরক্ষার জন্য নয়; বরং সমাজে সত্য, ইনসাফ, এবং দ্বীনে হককে বিজয়ী করার সংগ্রাম। এ যুদ্ধগুলোতে তিনি কেবল বাহ্যিক জয় নয় — চেতনার, আদর্শের, এবং মানবিক মর্যাদার বিজয় নিশ্চিত করেন। তিনি যুদ্ধেও করুণা ও ইনসাফের পরিচয় দিয়েছেন — যেমন মক্কা বিজয়ের দিন সাধারণ অপরাধীদের ক্ষমা করে দিয়েছেন, কিন্তু ইসলামের বিরোধিতা করে কটূক্তি করা শাতীমদের ব্যাপারে শাস্তির বিধান দিয়েছেন।

ইব্রাহিম (আ.) প্রার্থনা করেছিলেন: "**হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করুন...**" (সূরা আল-বাকারা: ১২৯)

আল্লাহ সেই দোয়ার জবাবে প্রেরণ করেন মুহাম্মাদ (সা) কে। তিনি শুধু ইব্রাহিম (আ.) এর দোয়ার জবাব নন, বরং মিল্লাতে ইব্রাহিম তথা ইব্রাহিম (আ) এর আদর্শের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নকারী। তাঁর মাধ্যমেই পূর্ণ হয় নাবুওতের সিলসিলা, এবং কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকর হয় "আল-ইসলাম" নামক একক জীবনব্যবস্থা, আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দ্বীন। নবীজি (সা) তাওহিদের বাস্তবায়ন এবং তাগুতকে বর্জনে চালিয়েছেন একাধারে আদর্শিক সংগ্রাম

(দাওয়াহ) ও তরবারির যুদ্ধ (কিতাল)। রাসুলুল্লাহ (সা) যে তরবারি বহন করেছেন, তা ছিল আল্লাহর শত্রুদের জন্য ভয়, আর মজলুমদের জন্য আশ্রয়। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম!

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

‘হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সা) এবং তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ কর, যেমন রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম (আ) ও তাঁর বংশধরের উপর, নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানী। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সা) এবং তাঁর বংশধরের ওপর বরকত নাযিল কর যেমন বরকত নাযিল করেছ ইবরাহীম (আ) ও তাঁর বংশধরের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানী।’